বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ট্রাম তুলে দিলে লাভ কার

রিওর বসুন্ধরা বৈঠক

বিজ্ঞানের স্বরূপ ও গণবিজ্ঞান

মহিলা বিকাশ কেন্দ্রের মেয়েরা

বজবজে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

রেলওয়েতে দুর্ঘটনা ঃ তদন্ত রিপোর্ট

খরোপি না হারাকিরি

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত—পঞ্চদশ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা—নভে-ডিসে '91 জানু-ফেব্রু '92—দাম দু' টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

নভেম্বর-ডিসেম্বর 1991 ※ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1992

পঞ্চদশ বর্ষ ※ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

1 আমাদের কথা

2 ট্রাম সম্বন্ধে দু একটি কথা
□ বিশেষ প্রতিনিধি

3 কলকাতা ট্রামের বর্তমান সংকট। সমাধান কোন পথে?
□ প্রতিবেদক

6 উন্নয়ন কার স্বার্থে? মহিলা বিকাশ প্রকল্পের মহিলারা
□ কাজল রায়

9 খরোসি না হারাকিরি
□ সত্য কর

10 বিজ্ঞান প্রযুক্তির মর্মরূপ এবং গণবিজ্ঞানের দিশার সন্ধানে
□ করবী রায়

15 অন্য চোখে রিও
□ সুরঞ্জন কর

18 বসুন্ধরা বৈঠক: পরিবেশ নিয়ে নেতাদের কথা বলার অধিকার আছে কি?
□ মেধা পাটকর

20 বজবজে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আমাদের বিপদ
□ বিজয় সরকার

23 রেথওয়েটে দুর্ঘটনা: প্রতিবেদন
□ এ. পি. ডি. আর ও ডিরোজিও গণবিজ্ঞান কেন্দ্র

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনের টাকা। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা মানি-ওর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে নাম-ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রযত্নে: অভিজিৎ লাহিড়ী □ পি 252 লেকটাউন □ ব্লক-এ, কলিকাতা, পিন 700089

পড়ুন ও পড়ান

- বিজ্ঞানশিক্ষা প্রাথমিক হালচাল
- বিজ্ঞানশিক্ষা মাধ্যমিক হালচাল
- না হিরোসিমা নাগাসাকি চাই না

প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

প্রযত্নে: অভিজিৎ লাহিড়ী

পি 252, লেকটাউন □ ব্লক-এ, কলিকাতা, 700089

আরো কয়েকটা পড়বার মত পত্রিকা

উৎসমানুষ / বিশ্লেষণ / গণ দর্পন / Safe Energy and Envirnmment / অহল্যা / চেনতা মানব পরিবেশ / দ্বান্দিক (দুর্গাপুর)।

পাবলিক সেক্টর, আক্রান্ত জলাভূমি, আক্রান্ত শ্রমিক

প্রযত্নে

নাগরিক মঞ্চ

134 রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড

রুম নং—7 □ কলিকাতা-85

আমাদের কথা

এই বছরের অক্টোবরে মে দ্যা স্টেটসম্যান পত্রিকা, লোকসভায় ভারতের প্রধান হিসাব-পরীক্ষকের (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটার জেনারেল) পেশ করা রিপোর্ট থেকে একটি তথ্য প্রকাশ করে।

তথ্যটি হল অডিটার জেনারেল ভারত সরকারের অ-প্রথাগত শক্তি উৎস দপ্তরকে তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং দায়ী করেছেন বেশ কয়েক লাখ টাকা নষ্ট করার জন্য। কারণ কম করেও চারটি বড় প্রকল্প পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

সৌরশক্তি ব্যবহার করে শুকোনর প্রকল্পটিতে 41 লাখ টাকা কন্ট্রাকটরকে দেওয়া হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পর কাজ না করেই তারা 38 লাখ ফেরত দেয়। অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট এটাকে বিনা সুদে কাউকে কয়েক বছরের মত গ্যারান্টি ছাড়া টাকা দেওয়ার সাথে তুলনা করেছে।

আপাত দৃষ্টিতে আর একটি ইকলজি-ভিত্তিক সুন্দর প্রকল্প ওই দপ্তর হিমাচল প্রদেশে সম্পূর্ণ করেছে। প্রকল্পটি হল, মাটির তলার তাপশক্তি ব্যবহার করে হিমঘর তৈরীর। বিশাল টাকা (দশ লাখের ওপর) এবং সময় খরচের পর এই কোল্ড স্টোরেজটি ভেঙে পড়েছে। বাড়ী তৈরীতে ওস্তাদ লোকেরা বলেছেন যে ঠিক করে মাটি পরীক্ষাই করা হয় নি। ফলে ভিতেই গলদ রয়েছে। জল চুঁইয়ে বেরোচ্ছে বাড়ীর মধ্যেই।

পাশাপাশি কৃষিতে যা ফেলে দেওয়া হয় সেইসব ঘাস-পাতা থেকে জ্বালানী তৈরীর জন্য 1 কোটি টাকার প্রকল্পও আটকে গেছে নানান কারণে। বিদেশী কোম্পানির তৈরী 'পাইলট প্ল্যান্ট' সম্বন্ধে বলা হচ্ছে দেশের মাপে দেশী মাল-মশলা ব্যবহার করলেই বোধ হয় ভাল হত।

'সৌরশক্তি চালিত পাম্প' প্রকল্পর অবস্থাও তথৈবচ।

এই সব খবরকে যদি আমরা রিওর 'আর্থ' সামিটে'র সাথে এক করে দেখি তা হলে কিন্তু একটা প্রশ্ন পরিস্কার বেরিয়ে আসে। তা হোল টাকা পাওয়া এবং টাকা খরচার প্রশ্ন। ধরুন আমাদের পরিবেশ মন্ত্রী প্ল্যানেট প্রোটেকশন ফান্ডে'র পুরোন পরিকল্পনাকে আবার নতুন করে তুলে ধরেছেন। ধরা যাক টাকা এল, এবং এই ধরণের সব প্রকল্পে দান হল। কি হবে তার পর?

* * * * * * *

খুব বিপজ্জনক একটি প্রবণতা দেখা গেল বজবজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রর জন্য জমি নিয়ে নেওয়ার সময়। কাগজের খবর অনুযায়ী ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের জন্য জমি দখল করতে আধা-সামরিক বাহিনী ই এফ আর পৌঁছে গেছে বজবজে। এর আগেও আমরা দেখেছি পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে 4 নং ভেড়ি মৎস্যজীবীদের সমবায়ে ই এফ আর বসান হয়েছে।

সমবায় ভিত্তিতে মাছ চাষ করতে চাওয়া বা দু ফসলা উর্বর জমি ভিত্তিক কৃষিজীবনকে আগামীতে নিশ্চিত পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে ধ্বংস করার বিরোধিতাকে কি তাহলে চুরি-ডাকাতি-ক্রাইমের সাথে এক করে দেখা হচ্ছে? শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা কি বলেন?

* * * * * * *

এক একটা শিল্প-দুর্ঘটনা ঘটে যায় আর উদাসীনতার জড়তা ভেঙে আমরা একটু নড়েচড়ে বসি। কারণ চারপাশ থেকে উড়ে আসতে থাকে নানান প্রশ্ন। হুল ফোটায় আমাদের বিবেকে। 'হ্যাঁ, আমরা রেথওয়েট দুর্ঘটনার কথা বলছি। ফার্নেসে গন্ডগোল ধরা পড়েছিল। তারপরেও উৎপাদন চালু করার হুকুম দেওয়া হল, কে দায়ী? বিশেষ পোশাকের বদলে মৃতদের আশেপাশে চিহ্ন পাওয়া গেছে সাধারণ কাপড় আর হাওয়াই চপ্পলের। কে দায়ী? বুট এসে পৌঁছেছিল, দেওয়া হয়নি, কে দায়ী? দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ফোন নেই, অ্যাম্বুলেন্স নেই ডাক্তার নেই, ই এস আই হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসা নেই। কে দায়ী? লোড-শেডিং, উপযুক্ত ট্রেনিঙের অভাব বা অন্যান্য অব্যবস্থার কথা না তুলেও প্রশ্ন করাই যায় উচ্চ-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ম্যানেজমেন্টকে। কতখানি দায়ী আপনাদের সীমাহীন অপদার্থতা আর, পাহাড়ের মত দুর্নীতি?

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন বোধহয় আজ আমাদের আর শ্রমিক বন্ধুদের নিজেদের দিকেই ছুঁড়তে হবে। কবে আমরা বুঝব যে পেশাগত ঝুঁকি আর শ্রমিকদের স্বাস্থ্যর ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে আমাদেরও। সে দায়িত্ব, পরিস্কার ভাবে তথ্য পাবার, সতেজ ভাবে জোর গলায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার, সে দায়িত্ব অধিকার বুঝে নেবার। তা নইলে শ্রমিকের জীবন বিপন্ন করে বারবার ঘটতেই থাকবে বিপর্যয়। □

কলকাতার ট্রাম

ট্রাম সম্বন্ধে দুএকটি কথা

কয়েক দিন আগে চোখ পড়ল খবরের কাগজের পাতায়। ট্রাম কোম্পানী নাকি বাস চালাবে! আর ট্রামের কি হবে? তাকে চলে যেতে হবে যাদুঘরে। উজ্জ্বল চেহারার ট্র্যাফিক বিশেষজ্ঞ তাঁর ঝকঝকে চশমার মধ্য দিয়ে তাকালেন—'এটাকে আপনি বলতে পারেন সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। আজকের দ্রুতগতির যুগে গত যুগের অলস ট্রাম আর খাপ খাওয়াতে পারছে না। তাই তাকে সরে যেতে হবে স্বাভাবিক নিয়মেই।'

ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম, সত্যিই কি তাই! ছোটবেলা থেকেই স্কুলে গেছি ট্রামে চড়ে। আমার মত যারা অল্পস্বল্প হাঁপানির রুগী তাঁরা জানেন যে বাসের থেকে ট্রামে তাঁরা কতটা বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। লক্ষ্য করে দেখেছি যে ছোট বাচ্চারা, মহিলারা বা যাঁদের বয়স পঞ্চাশের কোঠা পার হয়েছে তাঁরা কিন্তু ট্রামকেই বেশী পছন্দের যানবাহনের দলে ফেলেন।

কিন্তু না, এসব যুক্তি তো অচল। কারণ বেশী জোরে দৌড়নটাই নাকি উন্নতির লক্ষণ। তা না হলে এটাও তো ভাবা যেতে পারে যে কলকাতা শহরে ট্রামেই এখনো সব চাইতে সস্তায় যাতায়াত করা যায়। ট্রামের সেকেন্ড ক্লাস আছে। কিন্তু চিন্তার মাপকাঠির মধ্যে এই 'গরীব লোকে'র যানবাহনের প্রশ্নটা আনছে কে?

আপনাকে, আমাকে কেউ কি জিজ্ঞাসা করে 'বলুন তো, কলকাতা শহরে ট্রামের ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি?' তাও তো আমরা ভদ্রলোক, ফার্স্ট ক্লাসের মান্থলি টিকিট কাটা প্যাসেঞ্জার। যাঁরা চড়েন সেকেন্ড ক্লাসে তাঁদের তো দেখা হয় গরু-ছাগলের মত।

আমার সত্যি সত্যি জানতে ইচ্ছে হয় যে বিশাল বিশাল ব্যাপারে, যেমন ধরুন নর্মদা নদীর বাঁধ তৈরী থেকে মেট্রো রেল অবধি—কারা ঠিক করেন কি হবে, কেমন করে হবে। যেসব নারী-পুরুষ এদের আওতায় পড়বে, এবং যাদের টাকা, তাদের অনুমতি, মতামত, নিয়ন্ত্রণ—কোন ব্যবস্থা কি আছে সেগুলো ভাষা পাবার, বাস্তবায়িত হবার?

কয়েকজন মনে করলেন, আর গোটা কলকাতার কয়েক লক্ষ মানুষ আর বেশ কয়েক হাজার ট্রামকর্মী ও তাঁদের পরিবারকে বঞ্চিত করে ট্রাম উঠে গেল? ব্যাপারটা কি এই ভাবেই হওয়া উচিত?

এটা ঠিক যে ট্রাম নিয়ে সমালোচনা আছে। আমরাই তো মজা করে বলতাম 'ট্রামের ছোঁয়াচে রোগের সম্ভাবনা খুব বেশী। একটা খারাপ হলে পর পর সব কটা অসুস্থ হয়ে পড়ে'। চীৎপুরের সরু রাস্তায় ট্রামে চড়ার অভিজ্ঞতা তো আমাদেরও আছে। কিন্তু এটাও তো ঠিক বেশী রাতে বা ভোরবেলায় হাওড়া যেতে আজও অনেকে ট্রামের ওপরে ভরসা রাখেন। যদিও কাগজে বেরিয়েছে যে বেশী রাত বা ভোরবেলায় ট্রাম কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ লাভ হচ্ছে না। আবার প্রশ্ন জাগে কার লাভ, কি ধরণের লাভ, কে ঠিক করলেন? তিনি কি ট্রামে চড়েন, না ট্রামের লাইনে ওয়েল্ডিং এর কাজ করেন?

আসলে শহরের ভেতরে হোক কি শহরতলীতে যানবাহন কেমন হবে—রাস্তাঘাট কেমন হবে এসব ব্যাপারে ভুক্তভোগীদের একটা মস্ত বড় ভূমিকা আছে। চীৎপুর রোডে ট্র্যাফিক জ্যামের জন্য ট্রাম দায়ী না বেআইনী গাড়ি পার্কিং, গায়ের জোরে রাস্তা দখল, ট্রাক-ঠেলা গাড়ির মিছিল দায়ী—এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই দিতে পারেন।

ট্রাম তো আগে জোরে চলত, আজ চলে না। দায়টা কি শুধুই ট্রামের? কত গাড়ী বেড়েছে? ব্যবহার করার মত রাস্তা কতটা কমেছে। নিজেদের এলাকায় এসব তথ্য কিন্তু এলাকার মানুষজন জানেন।

আমরা শুধু কলকাতাকে দেখছি। কলকাতা—যেখানে একটুখানি জায়গার মধ্যে অসংখ্য গাড়ী-ঘোড়াকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। নজরটা বড় করলে কিন্তু চোখে পড়বে আজও হাওড়া থেকে একটু মফস্বলের দিকে যেতে লোকেদের কি অমানুষিক কষ্ট পেতে হয়।

মানুষ-জনকে জিজ্ঞাসা করুন। তাঁরা কিন্তু জানেন সমস্যাগুলো কি বিশাল। আর শহরের ভেতরে হোক কি শহরতলীতে—ট্রাম সেখানে বিরাট ভূমিকা পালন করতেই পারে। প্রয়োজনটা হোল তার চেহারাটা বদলানোর, তাকে মেরে ফেলার নয়।

বিশেষ প্রতিনিধি □

M/s. Lektron Enterprise
Manufacturer of Process Control Instruments
44/1, SOUTH ROAD
Calcutta-700 075
Phone: 72-5161 Gram: APOGEE Telex: 021-7252 IT 406

কলকাতা ট্রামের বর্তমান সঙ্কট সমাধান কোন পথে ?

কলকাতা থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার প্রশ্নে বিচলিত কিছু মানুষ আক্রান্ত ট্রাম শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে এই সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য গড়ে তুলেছেন এক মঞ্চ। স্টুডেন্টস হলে নাগরিক সভা ডাকার পাশাপাশি তাঁরা তৈরী করেছেন একটি তথ্য/দাবী পত্র। সামান্য সংক্ষেপিত অবস্থায় সেটি এখানে ছাপা হল।

—সঃ মঃ, বি ও বি

সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে এই মত প্রচারিত হচ্ছে যে ট্রাম শিল্পের সমস্যা এতই গভীর যে কলকাতা থেকে ট্রামকে তুলে দিয়েই সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন, রাজ্য পরিবহণ কর্তৃপক্ষকে ট্রাম তুলে দিয়ে ট্রামের জমি জায়গা বেচে ছাঁটাই শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় অর্থ দেবার সুপারিশ করেছেন (কালান্তর 21/12/91)।

ট্রাম তুলে দেবার মূল অজুহাত হল বিপুল পরিমাণ ভরতুকি দিতে হয় ট্রাম চালাতে এবং ট্রামের জন্যই যানজট সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে ট্রাম কোম্পানীর অবস্থা সত্যিই ভয়ংকর। একদিকে যেমন দিন দিন বেড়ে চলেছে ক্ষতির পরিমাণ, যাত্রী সংখ্যা কমে আসছে, কমছে চলতি ট্রামের সংখ্যা। ট্রাম শ্রমিক, কর্মচারীদের উপর নেমে আসছে একের পর এক আঘাত।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে অবস্থাটা কি আগেও এমন ছিল ? একসময় দৈনিক 11-12 লাখ যাত্রী বহন করতো ট্রাম। কলকাতায় গণ পরিবহণে ট্রামের ছিল অপরিসীম গুরুত্ব। 1980 সালে ভারত সরকারের পরিবহণ পরিকল্পনা কমিটি এই মত প্রকাশ করে যে, "শহরের বাস সার্ভিসকে উপযুক্ত ভূ-পৃষ্ঠ রেল সার্ভিস দিয়ে শক্তিশালী করার সম্ভাবনা হায়দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ, কানপুর, ব্যাঙ্গালোর বা পুনের মতো শহরের ক্ষেত্রেও খতিয়ে দেখা উচিত।

...এই ধরণের যানে একটা অতিরিক্ত সুবিধা এই যে এতে পরিবেশ দূষণ হয় না, দুর্ঘটনা কম হয় এবং দ্রুত চলবার যোগ্যতা রাখে।" তাঁরা ট্রামকে সংখ্যায় বাড়ানো এবং কারিগরির দিক দিয়ে উন্নত করার সুপারিশ করেছিলেন। '79 সালেও কর্তৃপক্ষের চিন্তা ছিল ট্রামের সংখ্যা বাড়িয়ে 500-র মতো করা হবে।

বাস্তবে অবস্থা দাঁড়িয়েছে কি ? ট্রামে দৈনিক যাত্রী সংখ্যা কমে হয়েছে প্রায় 5 লাখ। চলতি ট্রামের সংখ্যা কমে হয়েছে 209 (1991-র ডিসেম্বর 1ম সপ্তাহ)। কর্তৃপক্ষের মনোভাব 10 বছরের ব্যবধানে গিয়েছে উল্টে। যানজট, ক্রমবর্ধমান পথ দুর্ঘটনা, ভরতুকি সবকিছুর জন্য দায়ী যত নষ্টের গোড়া ট্রাম। অতএব ট্রাম তুলে দাও, রাস্তায় নামুক মিডি, ম্যাক্সি, স্পেশাল বাস।

আসলে বর্তমানে ট্রামের যা অবস্থা তা একদিনে হঠাৎ করে ঘটে যায়নি এবং কর্তৃপক্ষের বর্তমান মনোভাবও আকস্মিক নয়।

বিগত কয়েক বছরে আমলাতান্ত্রিক শোষণ, সরকারী ঔদাসীন্য ও খামখেয়ালীপনায় লোকসান বেড়েছে চড়া হারে। একদিকে ট্রামের সর্বক্ষেত্রে কণ্ট্রাক্ট প্রথা চালু করে বাধাহীন লুঠ, অন্যদিকে ট্রামে মজুত শ্রমশক্তিকে দিনের পর দিন অপচয়। এর ফলে ট্রাম কোম্পানী হয়েছে ধীরে ধীরে নিঃস্ব। আর এখন কর্তৃপক্ষ ও সরকার ক্রমবর্ধমান ভরতুকির কথা তুলছেন।

এই বিষয়ে এটাই বলার যে রাষ্ট্রের পরিসেবামূলক ক্ষেত্রে (যার মধ্যে পরিবহণ উল্লেখযোগ্য) ভরতুকি কোনও নতুন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর বহু উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই এই প্রথা চালু আছে। এই জন্যেই রাষ্ট্র তার নাগরিকদের থেকে কর আদায় করে। কাজেই ব্যাপারটা এমন নয় যে সরকার নিজের পকেট থেকে টাকা গুনছেন। পরিবহন শিল্প পরিচালনায় ব্যয়ের মধ্যে ভরতুকির অংশ ফ্রান্সে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 56 শতাংশ, কলকাতায় বাস বা ট্রামে কোথাও এটা 44 শতাংশের বেশী নয়।

তাছাড়া ভরতুকি বেড়ে যাওয়াই যদি ট্রাম তুলে দেওয়ার যুক্তি হয়, তাহলে তার আগে বাস সার্ভিসকেই তুলে দিতে হয়। কারণ 1985-86 থেকে 1988-89 সাল এই পাঁচ বছরে কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনে ভরতুকির পরিমাণ যেখানে ছিল 66.63 কোটি টাকা, সেখানে ট্রামে ছিল 66.71 কোটি টাকা। তাহলে বাসে ভরতুকি কম হলো কিসে ?

ভরতুকির পরিমাণ কমানো যায় লোকসানের হার কমিয়ে। এর জন্যে দরকার আয় বাড়ানো এবং যে কাজগুলি ট্রাম শ্রমিকরাই করতে পারে, সেগুলি কণ্ট্রাক্টে না দিয়ে তাদের দিয়েই করানো। এতে মিড্‌ল-ম্যানদের কমিশন দেওয়া বন্ধ হয়।

বাস্তবে নীতি নেওয়া হয়েছে ঠিক এর বিপরীত। ট্রাম সংখ্যা 340 থেকে কমে দাঁড়িয়েছে 209 তে। বর্তমানে চালু গাড়ীকেও বসিয়ে রাখা হচ্ছে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, লোকসানের জন্য ব্যয় সংকোচের নীতি নেওয়া হচ্ছে। ব্যয় সংকোচের নমুনা হলো, '91-এর অক্টোবর মাস জুড়ে দৈনিক 24 খানা গাড়ী ইচ্ছে করে কম বার করে লোকসান দিয়েছেন যেখানে প্রায় 9 লাখ টাকা, সেখানে বাড়তি মজুরী বাবদ

বাঁচিয়েছেন প্রায় 2.50 লাখ টাকা। সারা মাসে প্রায় 15 লাখ যাত্রীকে এঁরা ইচ্ছে করে ট্রামে চড়তে দেননি।

ইচ্ছে করে বলা হচ্ছে এই কারণে যে, চালু ট্রাম কমার যুক্তি দেখানো হচ্ছে মেরামতির অভাব, ড্রাইভার-কণ্ডাক্টার কম। অথচ ট্রামে 1270 জন কণ্ডাক্টর ও 351 জন ড্রাইভারের পদ খালি থাকা সত্ত্বেও লোক নেওয়া হচ্ছে না, শ্রমিকদের 26-27 দিনের বেশী কাজ করার যে অধিকার ছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছে, তার ওপর অনুপস্থিত শ্রমিকদের স্থলে অন্য শ্রমিকদের বেশী বেতনে কাজ করানোর প্রথাও তুলে দেওয়া হয়েছে '91 সেপ্টেম্বর থেকে। আর এর ফল হয়েছে কি? অগাষ্ট মাসে প্রথম 6 দিনে যেখানে 275 খানা গাড়ী রাস্তায় নামানো সম্ভব হয়েছিল, অক্টোবরে সেখানে নামে 244 খানা। লোকসান হয় দৈনিক 24 হাজার টাকা। এখন নাকি দৈনিক 60-70 হাজার টাকা করে লোকসান হচ্ছে। সত্যিই ম্যানেজমেণ্টের অদ্ভুত দক্ষতা!

যেখানে নোনাপুকুরে পুরাতন গাড়ী ও যন্ত্রাংশ মেরামত করে অনেক কম ব্যয়ে গাড়ীর সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব, সেখানে বাইরে থেকে বেশী দাম দিয়ে লোহার গাড়ী তৈরী করে আনা হচ্ছে। সেই বাইরে থেকে আনা গাড়ী 7-8 বছরেই অচল হয়ে যাচ্ছে। অথচ '74-'75 সালে কাঠের বডির ট্রাম এখনও চলছে। এখানে আর একটি কথা বলার যে ট্রাম লাইনগুলি তৈরী আগের হাল্কা কাঠের বডি অনুযায়ী, এখন বছরের পর বছর তার উপর দিয়ে চালানো হচ্ছে অনেক ভারী লোহার বডির ট্রাম। ফলে দুর্ঘটনা বাড়ছে, ট্রাম লাইনের ক্ষতি হচ্ছে অপরিসীম। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বারবার যে দামে বাইরে থেকে ট্রাম তৈরী হয় তার চার ভাগের তিন ভাগ দামে নোনাপুকুরেই করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ব্যয়সঙ্কোচকামী (!) কর্তৃপক্ষের সেদিকে নজর নেই।

ট্রামের লোকসানের কথা হচ্ছে অথচ ভবানীপুর লাইন চালু না হবার ফলে দৈনিক 55 হাজার টাকা আয়ের রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে।

আর একটি ব্যয়সঙ্কোচের নমুনা হলো, ট্রামের চলার রিজার্ভ ট্রাক তৈরী এবং সেগুলি ভাঙ্গানো—কোনও সহজবোধ্য যুক্তি ছাড়াই। দুটি কাজই করানো হয় বাইরের কণ্ট্রাক্টর দিয়ে। বসানো এবং তোলা দুটি ব্যয়ই দেখানো হয় ট্রামের অ্যাকাউণ্টে। যদিও এগুলির জীবন আরও বহুদিন ছিল। এগুলি তুলে দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ তো দেওয়াই হয় না, উপরন্তু নতুন লাইন বসানোর ব্যয় চাপে ট্রামের ঘাড়েই। তাছাড়া এই কাজে একমাত্র কংক্রীট করা ছাড়া বাকী সমস্ত কাজে যেখানে ট্রাম শ্রমিকরাই বেশী দক্ষ, সেখানে বাইরের কণ্ট্রাক্টর দিয়ে সমস্ত কাজ করানো হচ্ছে, যদিও ট্রামের পি ডবলিউ ডি-র শ্রমিক দিয়ে এই কাজ করালে তার খরচ অনেক কম এটা শ্রমিকরাও জানেন, কর্তৃপক্ষও জানেন।

ইদানীং কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি নিয়ে উন্মাদনার জন্যেও কম খেসারত দিতে হচ্ছে না ট্রাম কোম্পানীকে। রাস্তার রেলিং বসানো, শিয়ালদহ, উল্টোডাঙ্গার ফুটব্রীজ তৈরী থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের ঘোড়ায় টানা ট্রামে চড়ে স্ফূর্তির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা গুনতে হচ্ছে ট্রাম কোম্পানীকেই।

1967 সালে সরকারী অধিগ্রহণের আগেও ট্রাম কোম্পানীতে 17-18 লক্ষ টাকা লাভ ছিল। তারপর থেকে সরকারী পরিচালনাধীন এই তকমা সামনে রেখে ট্রামের পুঁজিকে এই রকম যথেচ্ছ লুঠ করার পরেও কোটি কোটি টাকা লোকসান হবে না কেন—সেটাই তো প্রশ্ন!

ট্রামের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ তোলা হচ্ছে ট্রামের জন্য যানজট সমস্যা বেড়েছে। সকলেই স্বীকার করেন আগের চাইতে যানজট বেড়েছে। কিন্তু ট্রামের সংখ্যা আগে ছিল বেশী। ট্রাম কমেছে, বাস অটো মোবাইলের সংখ্যা বেড়েছে। বাসের চলার জন্য ট্রাম চলাচলের রিজার্ভ ট্রাক ভাঙ্গা হয়েছে। এইজন্যই ট্রামের গতি কমে গেছে। প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতির জন্য সবসময় রাস্তায় যথেচ্ছ ট্রাক লরির তাণ্ডবে কলকাতা অচল হয়ে থাকে। যানজটের মূল কারণ ট্রাম হলে, যেখানে ট্রাম নেই সেখানে যানজট হয় কেমন করে? হাওড়া কিংবা কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুর মতো রাস্তাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে গাড়ী আটকে থাকে। সেখানে সেইভাবে ট্রাম কোথায়? ভারতে কলকাতাই একমাত্র বড় শহর যেখানে কোনও সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিবহন / ট্রাফিক নীতি নেই। যানজটের পিছনের এই আসল কারণগুলি চেপে রেখে ট্রামকে দোষ দিয়ে লাভ কি?

কর্তৃপক্ষের এই সমস্ত শ্রমিক বিরোধী, ট্রামের অস্তিত্ব বিপন্নকারী কাজের ধারা ও যুক্তি সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—কারণটা কি? কার স্বার্থে এই সমস্ত পদক্ষেপ? সাম্প্রতিক তেল সংকটের পর বহু উন্নত দেশ যখন ট্রামের মতো অটো-মোবাইলের বিকল্প যান চালানোর চেষ্টা করছে তখন এরা ট্রাম তুলে দিতে চাইছে কেন?

ট্রাম শিল্প ও ট্রাম শ্রমিকদের স্বার্থে যে এই সমস্ত পদক্ষেপ নয়, তা পূর্বের পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। ট্রাম শ্রমিকদের অবস্থা তো তথৈবচ। সর্বদাই তাঁরা একটা হুমকির মুখে কাজ করছেন। আর ট্রাম শিল্প? সে তো বাতিল হওয়ার সরকারী প্রস্তাবের সম্মুখীন।

আসলে ট্রাম-কোম্পানীর উপর বসে রয়েছে এক মাথাভারী প্রশাসন, যার ট্রামের সাথে কোনও আত্মিক যোগাযোগ নেই। সেই কারণে ট্রামের আরও প্রযুক্তিগত উন্নতি, ট্রামের নতুন লাভদায়ক রুট চালু করার ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা নেই। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কণ্ট্রাক্টর প্রথার কমিশন। অধিকাংশ কাজ কম খরচায় নিজের শ্রমিকদের দিয়ে না করিয়ে তাদের বসিয়ে রেখে কাজ দেওয়া হয় বাইরের কণ্ট্রাক্টদের। আজ ট্রাম তুলে দেওয়ার প্রস্তাবে এই চক্রের হতাশ হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। ট্রাম উঠে গেলে কলকাতার বুকে ট্রাম কোম্পানীর বিশাল জমি, ট্রাম শিল্পের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, স্পেয়ার পার্টস বেচা হবে খোলা বাজারে, লোভে এদের চোখ চকচক করে উঠছে। ইতিমধ্যেই

এরা ট্রাম কোম্পানীর ভেতর হাওয়া তুলে দিয়েছে, ট্রাম ডিপোগুলির মধ্যে দু-তিনটি বাসের জন্য রেখে বাকীগুলিতে তৈরী হবে দেশীয় বানিয়াদের সহযোগিতায় মার্কেট কমপ্লেক্স, বহুতল বাড়ী। আর তাই এদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদের আশা করা আহাম্মকি ছাড়া কিছু নয়।

কিছু কিছু শ্রামিক সংগঠন এবং প্রগতিশীল সংগঠন প্রশ্ন তুলেছে বাসকে কেন্দ্র করে যে পরিবহন নীতি নেওয়া হচ্ছে, তাতে যখন দৈনন্দিন পেট্রোল ডিজেলের জন্য বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তখন ট্রাম তুলে দেওয়া হচ্ছে কেন যাতে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন খুবই সীমিত, কারোর মতে এটা না হলেও চলে ?

বিশেষজ্ঞদের মতে 2037 সালেই সারা বিশ্বের তেল-ভান্ডার শেষ হয়ে যাবে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই এই শহরের লোক সংখ্যা উঠবে 179 লাখে। দ্রুত প্রসারমান এই শহরের সমস্ত মানুষকে যদি যাতায়াতের জন্যে কেবলমাত্র পেট্রোল ডিজেলে চালিত পরিবহনের উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে শহরবাসীর চূড়ান্ত সর্বনাশ হবে। দুষ্প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রার অপচয়ের কথা মাথায় রাখলে, এ হলো দেশেরও সর্বনাশ। তাই ট্রাম শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা, কেবলমাত্র কিছু শ্রমিকের অর্থ নৈতিক সংস্থানকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে সমগ্র পরিবহন ব্যবস্থাকে পরনির্ভরশীল করে দেওয়ার যে চক্রান্ত, তার বিরুদ্ধেও এক পদক্ষেপ।

তাই বর্তমান ট্রামশিল্পে যে বাস্তব সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তার নিরসন হতে পারে এক পরিকল্পিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই। সংকটের কারণ এবং উৎসকে চিহ্নিত করাই হবে এই সংগ্রামের প্রথম কাজ।

সরকারের বর্তমান নীতিকে পরিবর্তিত করতে দাবী তুলতে হবে—

ভরতুকির হার বৃদ্ধির অজুহাতে পরিবহন বা অন্যান্য জনসেবামূলক ক্ষেত্র থেকে বিনিয়োগ তোলা চলবে না।

স্বনির্ভর এবং শক্তি উৎসের দিক থেকে স্বাবলম্বী এক বিকল্প নগর-পরিবহন নীতি চালু করতে হবে।

এই দাবী অবশ্যই ট্রাম শ্রমিকদের একার দাবী নয়। কিন্তু ট্রাম শিল্প যখন এই বাস্তব প্রশ্নের সম্মুখীন, তখন এই লড়াইয়ে প্রথম নামতে হবে তাঁদেরই। শ্রমিক শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক মানুষকে এই লড়াইয়ের পাশে জড়ো করতে হবে।

ট্রাম তুলে দিয়ে ট্রামশিল্পের সংকটের সমাধান হতে পারে না। বরং আয় বাড়িয়ে লোকসান এবং ভরতুকির হার কমানো যায়। আয় বাড়ানোর জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা তুলে ধরতে হবে ট্রাম শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক মানুষকেই। কারণ এ সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত তাঁরাই।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিতে বারবার আলোচনায় উঠে এসেছে কতকগুলি পদক্ষেপের কথা। যেগুলি চালু করলে ট্রামের আয় বাড়ানো যায়ই। যেমন—

1) ট্রামের সংখ্যা বাড়ানো।

2) ট্রামের সমস্ত কাজেই ট্রামের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট প্রথা বাতিল করা।

3) ট্রাম লাইনের রি-মডেলিং এর জন্য পুরসভা থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

4) লাভজনক নতুন রুটগুলি চালু করা।

5) রুগ্নশিল্পকে সরকার থেকে যে সমস্ত ছাড় দেওয়া হয় অর্থাৎ ইলেকট্রিক ডিউটি ও বিক্রয়করের ছাড়ের অনুমতি ট্রামের ক্ষেত্রেও আদায় করা।

6) নতুন গাড়ী না কিনে নোনাপুকুরেই পুরাতন গাড়ী ও যন্ত্রাংশ মেরামত করে অনেক কম ব্যয়ে গাড়ী তৈরী করা।

7) কারখানা ও উৎপাদনের সর্বস্তরে কস্ট-অ্যাকাউন্টিং প্রথা চালু করা যাতে গড় ব্যয়ের ফাঁক দিয়ে অপব্যয় বন্ধ করা যায়।

8) টিকিটের পিছনে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বাড়তি আয় করা।

9) যানজটের সমস্যা কাটাতে কলকাতায় ট্রাক ও লরি নিয়ন্ত্রণ করা এবং অধিকাংশ রুটেই রিজার্ভ ট্রাকের ওপর দিয়ে ট্রাম চালানো।

10) ট্রামের প্রযুক্তিগত উন্নতির (যেমন ট্রামকে আরও দ্রুতগতি সম্পন্ন করা) জন্য এক বড় ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ করা।

11) ট্রাম শিল্প পরিচালন ব্যবস্থাকে আমলাতান্ত্রিক বোঝা মুক্ত ও গণতান্ত্রিক করতে হবে এবং এই শিল্পের পরিচালনায় ট্রাম শ্রমিকদের কার্যকরী অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

12) প্রযুক্তি এবং শক্তি উৎসের দিক থেকে স্বনির্ভর এক পরিবহন-নীতি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু এই কাজগুলি এতদিন হয়নি। কারণ সরষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে আছে। তাই বর্তমান সংকট সমাধানের জন্য এই পদক্ষেপগুলি কার্যকরী করতে গেলেও নির্ভর করতে হবে প্রধানত ট্রাম শ্রমিক এবং ট্রামের পুরাতন অভিজ্ঞ অফিসারদের ওপর। মাথাভারী প্রশাসন, ফড়ে কন্ট্রাক্টর, পার্টির দাদা আর সরকারী আমলা মিলে এক দুষ্ট চক্র আজ ট্রামকে এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে, তাদের কব্জা থেকে বার করে আনতে হবে এই শিল্পকে। আর এটা করতে হবে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করেই। এই প্রতিক্রিয়ার জন্য হাজার যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব পচতে থাকবে ফাইলের ভিতর। তা কোনও দিনই কার্যকরী হবে না।

ট্রামের বিকাশের রাস্তা আছে। কিন্তু এক জোরদার লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই খুলতে হবে সেই রাস্তায় যাওয়ার বন্ধ দরজাটা। প্রতিবেদক □

উন্নয়ন কার স্বার্থে ?

মহিলা বিকাশ প্রকল্পের মহিলারা

কাজল রায়

'92-র মার্চে রাজস্থান হাইকোর্ট থেকে একটা মামলার রায় বেরোয়। এ মামলার অভিযোগকারিণীরা হলেন রাজস্থানে সরকারী মহিলা বিকাশ প্রকল্পের 6 জন গ্রাম্য মহিলা কর্মী (5 জন সাথীন এবং একজন প্রচেতা বা সাথীনদের কো-অরডিনেটর) ঘটনাটা এই রকম।

'90-র ডিসেম্বরে মহিলা বিকাশ প্রকল্পে কর্মরত এই মেয়েরা গিয়েছিল কালিকটে—চতুর্থ সারা ভারত মহিলা সম্মেলনে যোগ দিতে। অবশ্যই তাদের নিজস্ব খরচে এবং তাদেরই নিজের হাতে গড়া সংগঠন 'কেকরী মহিলা সমূহের' ব্যানারে, মহিলা বিকাশ প্রকল্পের (উইমেন ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম বা WDP) ব্যানারে নয়। ফলে সম্মেলন থেকে ফেরার পরই WDP-র উচ্চপদস্থ অফিসাররা এদের মাঝরাতে দপ্তরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানাভাবে হেনস্থা করার পর কাজ থেকে ছাঁটাই করে বিনা কারণেই। WDP-র বক্তব্য সাথীন এবং প্রচেতারা সম্মেলনে প্রকল্পের ব্যানার ব্যবহার না করে তার সুনাম নষ্ট করেছে। ফলে এই শাস্তি। মেয়েরা এরপর কোর্টে যায় '91-র ফেব্রুয়ারীতে এবং মার্চে দেশের বেশ কয়েকটা মহিলা সংগঠনকে এ ঘটনার কথা জানায়। বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের একটা 'ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং টিম' এরপর রাজস্থান থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করে আনে তারই ভিত্তিতে তৈরী এ রিপোর্ট। সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে অবিলম্বে এদের কাজে ফেরৎ নেবার আদেশ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পটা চলে কিভাবে ?

রাজস্থানে গ্রামীন মেয়েদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীর সরকারের এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় '84-তে। প্রথমে 5টা গ্রামেই ছিল এর কেন্দ্রবিন্দু। পরে কাজ ছড়িয়ে যায় সারা রাজ্যে। এমনকি এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য রাজ্যেও এটা চালানোর কথা ভাবা হচ্ছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটা অংশ হলেও এ প্রকল্পে টাকা আসে ইউনিসেফ সহ আরও বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলো থেকেও। বিকাশ প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি জেলা এবং ব্লকে আছে যথাক্রমে 100 টা ও 10 টা করে 'মহিলা বিকাশ কেন্দ্র' প্রতিটি কেন্দ্র চালায় একজন করে সাথীন (গ্রামেরই মেয়ে)। এরকমই 10 টা কেন্দ্রের ভার আছে আবার একজন প্রচেতার উপর। কেন্দ্রে মেয়েদের সেলাই ফোঁড়াই ছাড়াও আছে লেখাপড়া শেখানো, সমাজ সচেতনতা গড়ে তোলা এবং বিশেষ করে সরকারী পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বোঝানো, জেলা স্তরে সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করে জেলা কালেক্টর, সঙ্গে থাকে প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং অফিসাররা। প্রতিটি জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আছে ইনফরমেশান ডেভেলপমেণ্ট এ্যাণ্ড রিসোর্স এজেন্সী (জেলা IDARA), যাকে কো-অরডিনেট করে রাজ্য IDARA. সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এ প্রকল্পটা রাজস্থান সিভিল সার্ভিস বিভাগের আওতাধীন। ফলে এখানকার কর্মচারীদের কাজকর্ম, মাইনে, ছুটি, চাকরীর সুযোগ সুবিধা সব কিছুই হওয়া উচিত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মত। কিন্তু তা হয় না, বিশেষতঃ নিম্নস্তরের মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে। কিরণ দুবে সাড়ে পাঁচ বছর প্রচেতার পোস্টে কাজ করেও ছাঁটাই হয়ে যায় বিনা কারণেই। টেম্পোরারী কর্মী হলেও তার P.F. কাটা হত নিয়মিতই ; রজনী শর্মা স্থায়ী LDC ক্লার্ক হলেও কাজ করত দিনমজুরীর ভিত্তিতে। স্টেনোগ্রাফার উর্মিলা, পে-স্কেল অনুযায়ী তাঁর মাইনে 2795/-, কিন্তু হাতে পায় মাত্র 1319/-, বাকি টাকা কি হয় কেউ জানে না। এরকম উদাহরণ এক নয়, আছে একাধিক।

সাথীনদের অবস্থা : লেখাপড়া জানা মেয়েদেরই যখন এই অবস্থা, তখন দরিদ্র, নিরক্ষর সাথীনদের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। WDP কিন্তু টিকে আছে সাথীনদের কাঁধে ভর দিয়েই। অথচ এরাই সব থেকে শোষিত বঞ্চিত। হেন কাজ নেই যা এদের করতে হয় না, কেন্দ্রের কাজ ছাড়াও বাড়ী বাড়ী গিয়ে মেয়েদের সরকারী পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বোঝানো, গ্রামীন প্রতিষ্ঠানগুলো সার্ভে স্টাডি, বিশ্লেষণ করা, কখন কোথায় কি ঘটনা ঘটছে তার খবর দপ্তরে পৌঁছে দেয়া, এসব তো নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। উপরন্তু গ্রামের বাইরে গেলে সবচাইতে পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলো কিন্তু করতে হয় তাদেরই, এবং সেখানে প্রজেক্ট অফিসারদের কাছ থেকে তারা ব্যবহারটা

পায় ঠিক বাড়ীর কাজের লোকের মত, এছাড়া ঘন ঘন জরিমানা, যখন তখন অপদস্থ করা এসব তো আকছার ঘটনা। কর্মচারী বলতে যা বোঝায় সাথীনরা কিন্তু সে অর্থে WDP-র কর্মচারী নয়, কারণ এরা এদের কাজের জন্য অনরারিয়ম হিসাবে পায় মাত্র 200/- টাঃ প্রতি মাসে। যেটা বেতন বা পরিশ্রমিক নয়, কারণ বেতন হলেই তাকে সরকারী কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর পারিশ্রমিকের অর্থ নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে নির্দিষ্ট টাকা। কিন্তু সাথীনদের কাজ এবং কাজের সময় কোনটাই নির্দিষ্ট নয়। এদের পরিশ্রমটা সারা দিন-রাতের। উপরন্তু বেতন এবং পারিশ্রমিকের মধ্যে যে কর্তা-কর্মীর সম্পর্ক আছে অনরারিয়মের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। এখানে কাজটাই নিজস্ব ইচ্ছাধীন, যে কেউ এখানকার কাজ ছাড়াও অন্যত্রও কাজ করতে পারে। কিন্তু WDP-তে ব্যাপারগুলো ঘটে একদম উল্টো। রার্মাপয়ারী, প্রেমা, রুকমা, নওরোতীরা WDP ছাড়াও অন্যত্র কাজ করত বলে তাদের ছাঁটাই করা হয়। আবার এরা সাথীনদের টাকাটাও বাড়ায় না। অনারারিয়ম বৃদ্ধির দাবিতে পদমনুরা গ্রামে 800 সাথীনের এক মিটিং WDP-র অফিসাররা পুলিশ এবং লাঠি দিয়েই ভেঙ্গে দেয়।

এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা

মহিলা বিকাশ প্রকল্পের উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য, মহিলাদের তথাকথিত "উন্নয়নের" আড়ালে এরা চায় যেন তেন প্রকারেণ সরকারী পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ ব্যবস্থাকে গ্রামের মেয়েদের উপর চাপিয়ে দিতে। একদিকে এরা মেয়েদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার স্বপক্ষে প্রচার চালায়, অন্যদিকে খরা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সময় মেয়েদের কাজ পাবার একটাই শর্ত—অপারেশন করাতে হবে, সে কিশোরী যুবতী বা প্রৌঢ়া যে কেউ হোক না কেন, আর এ ব্যবস্থায় অত্যন্ত নগ্ন ভাবে ব্যবহার করা হয় সাথীনদের। বন্ধ্যাত্বকরণ প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য তাদের সামনে রঙিন টিভি, ফ্রিজ, নগদ টাকার পুরস্কারের টোপও যেমন রাখা হয় সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে না পারার দরুণ তাদের প্রাপ্য অনরারিয়মের টাকাও কাটা যায়। '60 তে রাজস্থান স্বাস্থ্য দপ্তরের এক সার্কুলেশনে এই পরিবার পরিকল্পনার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্যাপারটা জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে আসে WDP তে, এবং তখন থেকেই একে সফল করার উদ্দেশ্যে সাথীনদের উপর নানাদিক থেকে চাপ আসে। অবস্থা এতই চরমে ওঠে যে পরের বছর 8 ই মার্চ যখন সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে, তখন সাথীনদের জেলা কালেক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ বাক্য বলানো হচ্ছে—"আমরা হয় এই সরকারী পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে সফল করব, নয়তো WDP-র সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করছি এই মর্মে দায়বদ্ধ থাকব।" ফলে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে গিয়ে কেকরী পঞ্চায়েত সমিতির 60 বছরের বৃদ্ধাদেরও অপারেশন করানো হয় একবার নয়, দুবার। আর কুয়ো খোঁড়া, গরুমোষ কেনা, বাড়ী সারানোর জন্য টাকা ধার দেয়া হয় তাদেরই যারা এই প্রোগ্রামকে সমর্থন করছে। অনেক সময় WDP তে সরাসরি অপারেশনের কথা বলা হয় না। যেহেতু গ্রামের মানুষেরই ঘরের লোক ফলে তাদের দিয়ে মেয়েদের উপর স্বাস্থ্য সমীক্ষা চালানো হয়। এই সমীক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের পেটের কথা টেনে বের করা যায় সহজেই। আবার এখনও পর্যন্ত কারা অপারেশন করায় নি সেটাও জানা যায়! এরপরই সাথীন এবং সেই মেয়েদের উপর অপারেশন করানোর জন্য চাপ আসে। '86 তেই তৎকালীন প্রজেক্ট ডিরেক্টর সরলা নাইডু আজমীর জেলার প্রচেতাদের লিখছে—"এই পরিকল্পনার প্রোগ্রাম চালাতে গিয়ে তোমরা যদি কোথাও কোন বাধা পাও, তবে সঙ্গে সঙ্গে বাধাদানকারীদের নাম ঠিকানা, শুধু জেলা স্তরেই নয়, বি. ডি. ও, পুলিশ, তহশীলদার এদের সকলের কাছেই পাঠিয়ে দিও।" মেয়েদের দিয়ে মেয়েদের উপর নিপীড়ণ করানোর এজাতীয় ঘটনা বোধহয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

WDP আসলে কি চায়?

WDP কিন্তু কোনদিনই চায়নি মহিলাদের উন্নতি হোক, তারা সচেতন হয়ে উঠুক, যদি তাই হোত তাহলে স্থানীয় মহিলা সংগঠন এবং আন্দোলনকে তারা ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা না করে তাকে সাহায্য করতে পারত। সাথীন এবং আশপাশের 15-20টা গ্রামের সক্রিয় মহিলারা যখন "কেকরী মহিলা সমূহ" নামে একটি স্বাধীন সংস্থা গড়ে তোলে তখন WDP ব্যাপারটা খুব একটা সুনজরে দেখে নি। 88'-তে খরার সুযোগে WDP-র বাড়াবাড়ি রকমের বন্ধ্যাত্বকরণ প্রোগ্রামকে এরা বাধা দেয়। এবং মেয়েরা যখন বিধবাদেরও জমির উপর অধিকারের দাবিতে স্থানীয় রাজপুত জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামে তখনও এ ব্যাপারে WDP উদাসীনই থাকে। আবার চাওসালা গ্রামের এক সাথীন যখন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার কারণে জরিমানা তাকেই দিতে হবে পঞ্চায়েতের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় তখনও কিন্তু WDP তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে নি। আসলে দেখা গেছে মহিলাদের সংগঠিত শক্তি যত বেড়েছে, সেখানে WDP সমর্থন ততই কমেছে। এরা চেয়েছে এদেশের নারী আন্দোলনও সরকারী আমলাদের হাত ধরেই আসুক। ফলে নলকূপ বসানো থেকে শুরু করে স্থানীয় ঝগড়া বিবাদ মেটানো এবং মদ্যপানের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছে পুলিশ প্রশাসন এবং আমলা দিয়ে। কিন্তু কোনভাবেই গ্রামে মদ আসা বন্ধ করতে পারেনি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এ জাতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু লোকের রুজি-রোজগার তো হচ্ছে!

কিন্তু তার থেকেও বেশি হচ্ছে মানুষের মনের কথা টেনে বের করার কাজ। হতদরিদ্র মানুষগুলোকে কিছু পাইয়ে দেবার রাজনীতি থেকেই এর জন্ম। এদের কাজে লাগিয়ে গ্রাম জীবনে কোথায় কি ঘটছে, কে কি ভাবছে, কোথায় কোন আন্দোলন দানা বাঁধছে তার খবর পাওয়া যায় আগেভাগেই, ফলে সেগুলোকে ভাঙ্গাও যায় সুপরিকল্পিত ভাবেই। অন্যদিকে সরকারী 'উন্নয়নের" ধারাকেও চাপিয়ে দেয়া যায় সাধারণ মানুষের উপরে। আর এসব প্রকল্পে বড়লোক দেশগুলো টাকা দেয় তাদের নিজের স্বার্থেই তৃতীয় বিশ্বের বাজার দখলটাই তাদের কাছে মূল কথা। তাই যে কোন সমস্যায় তারা তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যার দিকেই আঙ্গুল তোলে প্রথমে। যেন এটা কমলেই পৃথিবীর তাবৎ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আরে! মানুষ কি শুধু পেট নিয়েই জন্মায় নাকি? তার তো দুটো কাজ করার মত হাতও আছে। এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? সত্যিই যদি সরকার অবহেলিত পশ্চাৎপদ নারী জাতি সম্পর্কে এতই দরদী তাহলে কেন বন্ধ হয় না গ্রামে গ্রামে বাল্য বিবাহ? বিয়ের নামে মেয়ে পাচার, কন্যা ভ্রূণ হত্যার মত ঘটনা? ধরা যাক গ্রামে 15 বছরে কোন মেয়ের বিয়ে হল, 18/19-এ তার দুটো বাচ্চা হবেই। এরপর তার অপারেশন করানো হল, এখন যদি অপুষ্টি, অশিক্ষার শিকার হয়ে দুটো বাচ্চাই মারা যায় তখন এই মেয়েটির কি হবে? কারণ তার স্বামীটি তখন আবার সন্তানের আশায় দ্বিতীয় একটি বিয়ে করবেন। আর এ পোড়া সমাজ প্রথম মেয়েটিকে মেনে নেবে না কিছুতেই, কারণ এখনও এ গ্রামে মেয়েরা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। এবার সে যাবে কোথায়? বাঁচবে কিভাবে? নিজের সংসারে সেই তো তখন অন্যের কৃপার পাত্র। এইসব সমস্যার সমাধানের কোন গ্যারাণ্টি কি কেউ দিতে পারে? এই জাতীয় প্রকল্পগুলো একদিকে মেয়েদের কাজ দেবার নাম করে অজ্ঞতার সুযোগে তাদেরকে শোষণ করছে সরাসরি ভাবেই, অন্যদিকে মহিলাদের উন্নতির নামে তাদের আরও একবার "উন্নয়নের" হাড়িকাঠে বলি দেয়া হচ্ছে।

তথ্যসূত্র :—(1) Development for Whom ? A Report on the Women's Development Programme in Rajasthan (Oct. 1991).

(2) Copy of the order of Rajasthan High Court. (10 th March, 1992). □

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ডাকে যোগাযোগের নতুন ঠিকানা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

অভিজিৎ লাহিড়ী
P 252 লেক টাউন, ব্লক—A
কলকাতা-700089.

ভাবে মুক্ত করে ফেলা সম্ভবপর হবে। এবং এই বস্তুভিত্তিক জ্ঞান হবে এমন ধরণের জ্ঞান, যাকে যে কোন মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমে স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে যাচাই করে নিতে পারবেন। তাই যদি হয়, অর্থাৎ দ্রষ্টার থেকে দ্রষ্টব্য বস্তুকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলা যদি যায়, তাহলে বিভিন্ন মানুষের জ্ঞানকে সমন্বিত করে এক বিরাট জ্ঞানের ভাঁড়ার গড়ে তোলা সহজ হবে ; এবং এই জ্ঞান যেহেতু পরীক্ষানির্ভর কাজেই তার পূর্ব নির্ণয়ের ক্ষমতাকে (predictability) কাজে লাগিয়ে জনকল্যাণমূলক এবং বস্তু সভ্যতা সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই একদিন সম্ভবপর হবে—এই ছিল বেকনের বিশ্বাস।

মনে করুন উত্তর মেরুতে বসে কোন এক বৈজ্ঞানিক 'ক' বাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন পৃথিবী গোলাকার। আর কয়েক হাজার মাইল দূরের অন্য আরেক দেশে বসে অন্য আরেক 'খ' বাবু আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিধারে ঘোরে। এখন তৃতীয় আরেক দেশের মানুষ 'গ' বাবু অনায়াসে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন পৃথিবী সত্যিই গোল কিনা এবং তা সত্যিই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে কিনা। তার পরে এই দুই তথ্যকে সরাসরি যোগ করে দিয়ে তিনি যদি বলতে শুরু করেন যে পৃথিবী নামক গ্রহটি গোল এবং তা সূর্যের চারপাশে ঘোরে তাহলে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার তাতে বাড়বে বই কমবে না। মানুষের ভাবের জগতে এমন সহজ পদ্ধতি কিন্তু একেবারে অচল। যেমন মনে করুন—

'আশার ছলনে ভুলি / কি ফল লভিনু, হায়, তাই ভাবি মনে / জীবন প্রবাহ বহি / কালসিন্ধু পানে ধায়, / ফিরাব কেমনে?' এবং ধন্য আশা কুহকিনী 'তোমার মায়ায়, মুগ্ধ মানবের মন মুগ্ধ ত্রিভুবন,' —এই দুটি বক্তব্যকে সরাসরি যোগ করে দিয়ে আমরা যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে মানুষের জীবনে আশার প্রভাব নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক কোনটাই নয়, দুয়ের কাটাকুটির ফলে আসলেতে নির্ভেজাল শূন্য—তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে?

বেকনের নৈর্ব্যক্তিক বস্তুজগতের মুখে অঙ্কের নির্ভুল, নৈর্ব্যক্তিক ভাষা জোগালেন দেকার্তে। এতদিন মানুষের চেতনায় দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টব্য, গুণ (quality) এবং পরিমাণ (quantity) ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। গুণ জীবনের পরিবর্তনশীল বিচিত্র রূপ, তাকে অঙ্কের ফর্মুলায় বাঁধা অসম্ভব ; আর দ্রষ্টার সঙ্গে দ্রষ্টব্যকে মিশিয়ে ফেললে জ্ঞানের ক্রমবর্ধমানতা (cumulative nature) ক্ষুণ্ণ হয়। নতুন যন্ত্রসভ্যতার চেতনায় তাই দ্রষ্টার এবং গুণের অস্তিত্ব ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে গেল। পড়ে রইল যা তা হল এক আদর্শ জড় পদার্থের জগৎ (abstract matter)।

এই 'আদর্শ' জড় পদার্থকে গতিময় করে এই নতুন সভ্যতার হাতে উৎপাদনের অসাধারণ শক্তিশালী যন্ত্র পরোক্ষে তুলে দিলেন যিনি—তার নাম আইজাক নিউটন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জোরে সারা দুনিয়ার যাবতীয় গতিবিধিকে এক নিমেষে সরল সমীকরণের আওতায় বেঁধে ফেলা গেল। সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহের গতিবিধি চমক হারিয়ে হয়ে দাঁড়াল দুই আর দুইয়ে চারের মত সহজ নির্ভুল, উঠোনের পড়ন্ত আপেলটির মতই আগে ভাগে জানা।

আকাশের গ্রহ তারা সুবোধ বালকটির মত গুটি গুটি পায়ে পায়ে গতিসূত্রের আইন মেনে হাঁটছে ; অথচ মানুষের সমাজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, এখানে সবকিছুই যেন নিয়মহারা 'বিশৃঙ্খল'। এই বিশৃঙ্খলার কারণ নিরূপণ করে পদার্থের গতিসূত্রের ধাঁচে সমাজটাকে ঢেলে সাজাতে গেলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী জন লক (1632—1704 ও এ্যাডাম স্মিথ (1723-1790)

লক বললেন যে সংস্কার ও রীতিনীতির অহেতুক বেড়াজাল সত্ত্বেও যে কোন সমাজের উদ্দেশ্য মূলতঃ একটাই মানুষের সম্পদবৃদ্ধি। লকের মতে এইটিই সমাজের 'সবচেয়ে স্বাভাবিক ভূমিকা'। প্রত্যেক মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা, আর প্রকৃতির জঠর থেকে আরও আরও সম্পদ ছিনিয়ে আনার ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের। নিউটনের গতিসূত্রের মত সমাজের এই গতিসূত্রও অমোঘ, সর্বব্যাপী। সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের মত মূল্যবোধের সীমারেখা এখানে অচল।

লকের কলমের এক খোঁচায় সারা দুনিয়ার সব মানুষ কেবল উৎপাদক এবং ভোগ্যপণ্যের খরিদ্দারে পরিণত হল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ এবার ঠাঁই পেল আরেক দেবতার পায়ের তলায়—যার নাম বস্তুবাদী আত্মকেন্দ্রিকতা। স্বপ্ন, কল্পনা, আবেগকে ছুটি দিতে হল, কারণ তারা গতিসূত্রের নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ল না। মানুষের আশা-আকাংখা এবার ঘুরতে শুরু করল কেবল মুনাফা বাড়াবার আর ভোগ্যপণ্য ঘরে তোলার অশেষ তাগিদকে কেন্দ্র করে। নতুন দেবতার অমোঘ আইন সমাজের 'বিশৃঙ্খলাকে' দূর করল অবশেষে—খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে।

এরপর যন্ত্রসভ্যতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়তে বসলেন এ্যাডাম স্মিথ। নিউটনের গতিসূত্রের ধাঁচে অর্থনীতির 'স্বাভাবিক গতিসূত্রকে' (Natural order of society) সবার ওপরে জায়গা করে দিলেন তিনি। প্রত্যেক পুঁজিপতি তার ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়াবার উদ্দেশ্যে কোন না কোন পন্থায় তার পুঁজির বিনিয়োগ করছে, আর এই বিনিয়োগের ফলেই বাড়ছে সমাজের উৎপাদনশক্তি, বাড়ছে সম্পদ। যন্ত্র সভ্যতার নক্সা অনুযায়ী এই সম্পদ বৃদ্ধিই হল মানুষের প্রগতির কেন্দ্রবিন্দু, সমাজ কল্যাণের উৎস। অতএব পুঁজিবাদের এই 'স্বাভাবিক গতিসূত্রে' সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটলো। অবাধ মুনাফার অধিকার সরকারী বাধা নিষেধের ফলে অংশত ব্যাহত হলে 'উৎপাদনের হার' যাবে কমে। স্মিথের মতে সমাজের কল্যাণ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্মিথের সময় থেকে 'উৎপাদনের হার' সমাজের প্রগতির

অন্যতম বিজ্ঞানসম্মত সূচক (parameter) হয়ে দাঁড়াল। প্রযুক্তির বিবর্তনে এবং মানুষের সঙ্গে তার উৎপাদন যন্ত্রের সম্পর্কের ইতিহাসে এর বিশেষ ভূমিকা পরে আলাদা করে বুঝতে চেষ্টা করব।

প্রযুক্তির ভূমিকা—নানা চোখে

আধুনিক প্রযুক্তি মানেই উন্নত উৎপাদন আর উৎপাদন মানেই প্রগতি, এই হল একুশ শতকের দিক নির্দেশক বার্তা। কিন্তু সত্যি কি তাই? কারখানার ভেতরের ছবিটির দিকে একবার চোখ ফেরানো যাক। বুঝতে অসুবিধে নেই যে সেখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকের টানাপোড়েন সর্বদাই চলছে। শুধু মাইনের কিম্বা বোনাসের মীমাংসা নিয়েই নয়, উৎপাদনের প্রক্রিয়াটাকে নিয়েও ঠান্ডা গরম হাজার লড়াই সেখানে চলে দিনরাত। কতটা উৎপাদন এবং ঠিক কিভাবে করা হবে, কে তা ঠিক করে দেবে? মালিক বলে আমি দেব, এবং এমনভাবেই দেব যাতে মুনাফা আমার বেড়েই চলে। তার হাতে হাতিয়ার অনেক, নতুন টেকনোলজি, একই কাজের নতুন নতুন ভাগ বাঁটোয়ারা, কাজের খানিকটা ভাগ বাইরের কন্ট্রাক্টারের হাতে দিয়ে দেওয়া, কারখানার খানিকটা তুলে নিয়ে এমন কোন এক অনুন্নত অঞ্চলে চলে যাওয়া, যেখানে সরকারী কনসেশন মেলে, যেখানে কম পয়সা দিয়ে অনেক মজুর পাওয়া যায়, কিম্বা স্ট্রাইক যেখানে সহজে হয় না।

মোদ্দা কথাটা এই যে আমাদের মস্ত বড় যন্ত্র সভ্যতারই ছোট এক বালক দেখি আমরা আমাদের এই মালিকের কারখানায়। একটা লেদ কিম্বা একটা ড্রিলিং মেশিনের মত একজন শ্রমিকও সেখানে উৎপাদনের কোন এক যন্ত্র; চোখ কান বুজে উৎপাদনের হার ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলাই যার একমাত্র কাজ।

আর শ্রমিক এর প্রত্যুত্তরে কি করে? উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মালিকের এই সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণের সে বিরোধিতা করে সর্বদাই—কখনও পুনার টেলকোর কারখানার শ্রমিকদের মত সচেতন এবং সংগঠিত ভাবে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই বিচ্ছিন্ন এবং অসচেতন ভাবে, যতটা সম্ভব ধীর গতিতে কাজ করে, ঘন ঘন কামাই করে, এমনকি মদ খেয়ে খেয়ে নিজের কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েও অসংগঠিত শ্রমিক এই বিপুল যান্ত্রিক আয়োজনের বিরুদ্ধে অক্ষম প্রতিবাদ করে।

শ্রমিকের চোখে নতুন টেকনোলজি তাই মালিকের এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার অন্যতম হাতিয়ার। মালিক যখন বলে, টেকনোলজি হল সব দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অনিবার্য ফসল, আধুনিক বিজ্ঞানের অপূর্ব অগ্রগতিই নতুন টেকনোলজির মধ্যে আপন মহিমায় প্রস্ফুটিত হচ্ছে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি থেকে নিত্য নতুন মেশিনের আমদানি একেবারে অপরিহার্য—শ্রমিক তখন ব্যাপারটাকে নিজের মনে কিছুতেই গ্রহনীয় বলে মনে করে না। তার পরে চলে লড়াই, শেষে ভাগ বাঁটোয়ারা। মাইনে বাড়ে খানিকটা, নতুন মেশিনও বসে। বসে এমনভাবে যাতে শ্রমিক-পিছু উৎপাদনের হার বাড়ে। ফলে মুনাফাও বাড়ে; শ্রমিকের সংখ্যাও কমে ক্রমশ, নতুন টেকনোলজির হাত ধরে খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। কারখানার আধুনীকিকরণের এই লড়াইটার কথা আমরা কমবেশী সবাই জানি। টেকনোলজিকে তবু সব দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে এবং অবশ্যম্ভাবী দিব্যশক্তি হিসেবে মেনে নিই সহজেই। একটা ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়ে আমাদের এই ভুল বোঝার গভীরতাটুকুকে আরও একটু স্পষ্ট করে বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

বিজ্ঞানসম্মত ম্যানেজমেন্ট, মোটরগাড়ীর কারখানা এবং সমাজতন্ত্র

কারিগর অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, জীবনের নানা উপাদান ধীরে ধীরে গড়ে তোলে। একতাল মাটি থেকে একটা মূর্তি গড়ার মধ্যে, কিম্বা এক বান্ডিল সুতো থেকে একখানা কাপড় বোনার মধ্যে আছে সৃষ্টিশীল জীবনের প্রকাশ। কল্পনা, গঠন ও ব্যবহারিক প্রয়োগের সমন্বয়ে, কারিগর তাই একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

কলকারখানার চৌহদ্দির মধ্যে আর যাই থাক না কেন, এই সৃষ্টিশীলতার বালাই নেই। গুটিকয়েক উচ্চপদস্থ সুপারভাইজার এবং বেশ কিছু হাতে কাজ করা হাড়হাভাতে শ্রমিক, এই নিয়ে গড়ে উঠেছিল শিল্প বিপ্লবের কারখানা। মাথার সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের এই চূড়ান্ত বিচ্ছেদের পটভূমিতে আধুনিক ম্যানেজমেন্টের নতুন নতুন চিন্তাভাবনা ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছে। এর প্রথম ধাপ হল কর্মবিভাজন। একটা কাজকে টুকরো টুকরো করে সহজতর অনেকগুলো কাজে ভেঙ্গে ফেলে বিভিন্ন শ্রমিকের মধ্যে তার দায়িত্ব-ভাগ করে দেয়া। এইভাবে দক্ষ কারিগরের জায়গা করে নিল খণ্ডিত শ্রমিক। তার পরের ধাপে এই শতকের গোড়ায় এল টেলরের টাইম মোশন স্টাডি। যার উদ্দেশ্য কাজের সময় ও গতির সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণ। আসুন তাহলে বিজ্ঞানসম্মত ম্যানেজমেন্টের আদি হোতা টেলরের বক্তব্যের দিকে এবার একটু চোখ ফেরানো যাক্। কাজের প্রতিটি অংশে শ্রমিকের বিশেষ অঙ্গ সঞ্চালনটিকে ঠিক মেশিনের মত করে বিশ্লেষণ করতে পারলে, তার গতি ও ছন্দ একেবারে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বেঁধে দেওয়া সম্ভব হবে আর তাহলে উৎপাদনের হার যাবে বেড়ে—এই ছিল টেলরের মূল বক্তব্য। পরে সমাজের এবং শ্রমিক আন্দোলনের টানাপোড়েনে ম্যানেজমেন্টের এই তত্ত্ব সংশোধিত ও পরিশীলিত হলেও, মূল চিন্তাধারার হেরফের বিশেষ হয়নি। একথাটা বিশেষভাবে মনে রাখার দরকার যে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর কর্তৃপক্ষের সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার এই তাগিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আধুনিক প্রযুক্তি। যে মেশিন চালু করলে উৎপাদনের গতিপ্রকৃতিকে আরও বেশি বশে রাখা মালিকের পক্ষে সহজ হয়, তাকেই আমরা বলে থাকি 'উন্নত

টেকনোলজি'। অথচ আজকের 'উন্নত টেকনোলজির' আপাত ভাবলেশহীন 'বিজ্ঞানসম্মত' চেহারাখানার দিকে তাকিয়ে, তার এই বিশেষ শ্রেণীচরিত্র আমরা ভুলে যাই সহজেই। তাই বোধহয় বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার কারখানায় সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য স্বয়ং লেনিন টেলরিজমের মত একটি চরম শ্রমিকবিরোধী পদ্ধতির আমদানী করতে পেরেছিলেন।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল এই শতকের গোড়ায়, ফোর্ডের কারখানায়। মোটর গাড়ীর কয়েকশো ছোট বড় অংশকে আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন জায়গায় তৈরী করার পর একটি চলন্ত এ্যাসেমব্লী লাইনের সাহায্যে দ্রুত গতিতে তাদের জোড়া লাগান হয়। এই চলন্ত লাইনের দুধারে বসে থাকেন শ্রমিকেরা, যে যার নিজের জায়গায়। অসমাপ্ত মোটরগাড়িটি সামনে এসে পৌঁছনমাত্র যে যার নিজের কাজটুকু চট্ করে করে ফেলেন। যেমন একজন হয়তো কয়েকটি বিশেষ নাট বোল্ট লাগান, পরের জন হয়তো সেগুলিতে প্যাঁচ কষেন। নিজের বাঁধা কাজটুকু হয়ে গেলে আবার চলন্ত লাইনের ওপর এগিয়ে আসা পরবর্তী গাড়ীটির প্রতীক্ষায় থাকেন। কত তাড়াতাড়ি তিনি নিজের নিয়ম মাফিক কাজটুকু সম্পন্ন করবেন, তা তাঁর নিজের গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না; চলন্ত লাইনের গতিই তাঁর কাজের গতিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। হাজার হাজার মোটর গাড়ীর নির্ধারিত গর্তে নাট বোল্ট লাগানর মত চিন্তাবিহীন অতিসরল কাজে জীবন কাটে যার, নতুন কিছু শেখবার, জানবার, কিম্বা ভাববার সুযোগ তার কোথায়? টেলরের শ্রমিকও তাই 'উন্নত টেকনোলজি'র দাবি মেনে নিয়ে ক্রমশ হয়ে দাঁড়ায় চিন্তাশক্তিহীন মেশিনেরই আরেক অঙ্গ। মেশিনের স্পেয়ার পার্টসের মতই সহজলভ্য। দরকার মত আরেকখানা সস্তাদরে বাজার থেকে কিনে এনে চট করে যাকে বদলে ফেলা যায়। এ শতাব্দীর গোড়ায় টেলরের 'বিজ্ঞানসম্মত ম্যানেজমেন্টের' বিরুদ্ধে আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলো যখন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনই সদ্যোজাত সোভিয়েত রাশিয়ার কলকারখানায় দুনিয়ার প্রথম সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'বৈজ্ঞানিক টেলারিও পদ্ধতির' অনিবার্য আমদানী ঘটেছিল। আবার মনে করুন, 70-এর দশকে ইটালীর ফিয়েট গাড়ীর কারখানায় মানববিরোধী উৎপাদন পদ্ধতির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যখন প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় ঐ ফিয়েট গাড়ী তৈরীর 'উন্নত টেকনোলজি' সোভিয়েত রাশিয়ায় আমদানী করা হয়। এমনটা কেন ঘটল? আমাদের যন্ত্র সভ্যতার বুর্জোয়া নক্সাটা যে সে জগতের টেকনোলজির হাড়ে মজ্জায় মিশে আছে, এ্যাসেমব্লী লাইনে শ্রমিক এবং সুপারভাইজারের ভূমিকা যে ক্যাপিটালিস্ট ইটালীর মতই লেনিনগ্রাডের কারখানাতেও পূর্ব নির্ধারিত, মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের পূর্ণ বিচ্ছেদের ভিত্তির ওপরেই যে এ টেকনোলজি তিলে তিলে গড়ে উঠেছে তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। ফোর্ডের 'উন্নত টেকনোলজি'কে বৈজ্ঞানিক প্রগতির অনিবার্য ফসল বলে মেনে নেয়ার ফলেই বোধহয় সমাজতান্ত্রিক দেশেও এর অভিযান বাধা পায়নি।

আমরা কি করব?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রগতির প্রতিশব্দ হিসেবে মেনে নেবার বিপদ অনেক। আজকের দিনে সারা পৃথিবীর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণাই যখন মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানীগুলোর অর্থে লালিত পালিত হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানের মতাদর্শ এবং প্রযুক্তি যখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর প্রভুত্ব কায়েম করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিশেষ ভাবে স্বীকৃত, তখন চোখ কান খুলে না চললে আর উপায় নেই।

আমরা তাহলে কি করব? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শিকেয় তুলে দিয়ে রামরাজ্যের গুণগান গাইব? নাকি নিউটনের গতিসূত্র আর আইনস্টাইনের অপেক্ষিক তত্ত্বকে সসম্মানে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে সমস্বরে হরিবোল গাইব? না, এর কোনটাই করব না আমরা। বিজ্ঞানবিরোধী এবং অতিবিজ্ঞানী, এই দুই মনোভাবের বিপদকেই সযত্নে এড়িয়ে চলতে শিখব।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে বুর্জোয়া সভ্যতার নিবিড় গাঁটছড়ার সম্পর্কটাকে প্রতিপদে খুঁটিয়ে বুঝতে শেখা, এই হবে আমাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেশের মানুষ, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে গেলে ঠিক কি ধরণের প্রযুক্তি আমাদের কাম্য, তা আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। ইটালী, আমেরিকার মোটর কারখানার শ্রমিকেরা তাঁদের যন্ত্রপাতিগুলোকে ঠিক কি চোখে দেখেন তা বোঝবার জন্য তাঁদের দেশের বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধান চালিয়েছেন, অনেক তথ্যসমৃদ্ধ বই লিখেছেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক অসন্তোষের চেহারাটাকে বুঝে নিয়ে, বিপজ্জনক জায়গাগুলোতে কিছু ছাই চাপা দেবার ব্যবস্থা করা। বিকল্প এক প্রযুক্তির কাঠামো কিরকম হতে পারে, তা নিয়ে উৎপাদনশীল কৃষক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে সত্যিকারের আলোচনার সংগঠিত প্রচেষ্টা কেউই প্রায় করেন নি। মাও সে তুঙ-এর চীনে টুকরো টুকরো চেষ্টা হয়তো বা কিছু হয়েছিল তাও—আমাদের ভালভাবে জানা নেই। আর আমাদের নিজেদের দেশের রক্তমাংসের কৃষক এবং শ্রমিকেরা চাষের এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন যন্ত্রের 'বিজ্ঞানসম্মত' বিবর্তনকে ঠিক কি চোখে দেখেন, কি তাঁরা চান, এবং কেন চান সে সম্পর্কে বলতে গেলে কোন তথ্যই আমাদের জানা নেই। এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে, পরস্পরকে বোঝা ও বোঝানোর ব্যাপারে, নিজেদের সীমিত চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে,

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা সক্রিয়ভাবে কতটা এগিয়ে আসতে পারেন তা বিশেষ করে ভেবে দেখা একান্ত দরকার।

ওয়ার্কশপে যখন একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিন বসে, তখন শ্রমিকের দক্ষতার আর বিশেষ কোন দাম থাকে না। একজন দক্ষ শ্রমিক, যিনি লেদ কিম্বা মিলিং মেশিন চালিয়ে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে নিখুঁত মাপের জিনিসপত্র তৈরী করতে পারতেন, নিজের কাজের মান সম্পর্কে এযাবৎ-কাল তাঁর গর্ব ছিল অনেক, অন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে সহজেই শ্রদ্ধা পেতেন তিনি, আর কর্তৃপক্ষ অনেক টানাপোড়েন সত্ত্বেও তাঁকে খানিকটা সমীহ করে চলত। নিজের কাজ সম্পর্কে এই গর্ববোধ তাঁকে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর জোরটুকুও দিত। শপফ্লোরে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত নেতার আসনটি তিনি সহজেই নিতে পারতেন। নতুন মেশিনটি বসার পর ঐ মানুষটি হয়তো গেলেন হারিয়ে।

কেবল চোখ কান বুজে উৎপাদন বাড়িয়ে চলাই নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মগজের সঙ্গে হাতের কাজের বিভেদকে ক্রমশ কমিয়ে আনা বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের দ্বন্দ ঘুচিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, এই যদি আমাদের মূল লক্ষ্য হয় তাহলে আজকের বৈজ্ঞানিক ইমারতের অনেকখানি কাঠামোকেই বোধহয় ভেঙ্গেচুরে ঢেলে সাজাতে হবে। সেই নতুন ব্যাপকতর চিন্তার জগতে এমন অনেক নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা বিকশিত হবে, যন্ত্রসভ্যতার সীমিত নক্সাটিতে যাদের কিছুতেই আঁটান যেত না। উৎপাদনের উপরে ভবিষ্যতের কর্মীভিত্তিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ধরনের প্রযুক্তি কাম্য, তাকে খুঁজে বের করা, গড়ে তোলার চেষ্টা করা এবং তার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করাই হবে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রধান কাজ। উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দুতে যন্ত্রের বদলে মানুষকে ফিরিয়ে আনতে পারলে খণ্ডিত শ্রমিক আবার একদিন মানুষ হবে। □

এইডস্ ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন

এইডস্ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে বিজ্ঞানীরা যে নতুন টিকা উদ্ভাবন করেছেন তা পরীক্ষা করার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে স্থির হল, এই পরীক্ষার গিনিপিগ হবে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ। এই ঘৃণ্য, অমানবিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত 6ই এপ্রিল দিল্লীতে WHO'র দপ্তরের সামনে 'এইডস্ ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন' এর কর্মীরা সারাদিন ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। আর তার মধ্যে দিয়েই স্মরণ করলেন সদ্য হারানো অক্লান্ত কর্মীবন্ধু সিদ্ধার্থ গৌতমকে। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরো 30টির মত সহকর্মী সংগঠন। স্থানীয় কুষ্ঠরোগীদের কলোনী আর বস্তী থেকেও এসেছিলেন অনেকে। তাঁরাও বললেন তাঁদের সমস্যার কথা। মহিলাদের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সহেলী'র সদস্যারা অভিনয় করলেন একটি পথনাটিকা। তার বিষয় হল—কিভাবে 'নরপ্ল্যান্ট' নামক নতুন গর্ভনিরোধকটি নারীদেহের অপরিসীম ক্ষতি করে, আর কিভাবে WHO এটিকে তৃতীয় বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলন করার চেষ্টা করছে।

উপস্থিত সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি WHO'র দপ্তরে একটি স্মারকলিপি দিয়ে আসেন এবং WHO-র অফিসারদের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলেন।

খরোসি না হারাকিরি

জাপানের কথা উঠলেই আমরা প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাই না। বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশ না কি জাপানের কাছে ঘোল খেয়ে যাচ্ছে। ওদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতার পাশে আমাদের কারখানা, আমাদের রেলওয়েজ, যোগাযোগ বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি—আরে ছোঃ। এসব কথা তুলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন। এইত সেদিন আমাদের মেজকর্তা বলছিলেন জাপানি ম্যানেজমেণ্টের কোন তুলনাই হয় না। আর মজদুররা? মোটেই আমাদের মত ঢিলেঢালা দেশী মাল নয়। তারা রীতিমত কাজ শুরুর খানিকটা আগে আসে আর ছুটির সময় পার করে বাড়ী যায়। হবে না এদের উন্নতি?

উনি যেটা বললেন না সেটা হল শুধু লম্বা সময় নয়, জাপানি মজদুর ছুটিও নেয় কম। একটা হিসেব অনুযায়ী জাপানে গাড়ী তৈরীর শিল্পে একজন আট ঘণ্টা খেটে গড়ে কাজ করে বছরে তিনশ দিন অর্থাৎ 2400 ঘণ্টা। এই তিনশ দিনের কাজ যদি সে আড়াইশ দিনে সেরে ফেলতে চায় তবে যা হবার তাই অর্থাৎ দিনেরাতে কোন ছন্দ ছাড়াই খাটতে হবে তাকে।

অদ্ভুত এক প্রথা চালু রয়েছে আজকের জাপানে, যাকে বলে 'সার্ভিস ওভারটাইম'। এই প্রথায় মজদুর খানিকটা সময় কোম্পানীকে দান করে দেবে। অর্থাৎ সেই সময়টা সে খাটবে তার রোজকার কাজের পাশাপাশি কিন্তু খাতায় পত্রে সেটা দেখান হবে না!

সত্যি কথাটা হল ভয়ঙ্কর খাটুনির ফলে জাপানে মজদুর মৃত্যুর হার বাড়ছে। এদের বেশীর ভাগের বয়সই ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর। 1991 সালের জুন মাসে জাপানি ডাক্তার আর উকিলরা তথ্য জোগাড় করেছে—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতি চারজনে একজন জাপানি মজদুর ভয় পাচ্ছে যে চল্লিশের কোটা সে আর পার হতে পারবে না। বাস্তবত যদি কেউ কাজের চাপে মারা যায় তবে তার শোকগ্রস্ত পরিবার বা তাদের উকিলকে প্রচণ্ড লড়তে হচ্ছে শুধু এইটুকু প্রমাণ করার জন্য যে মজদুরটি অত্যাধিক খাটা-খাটুনির ফলেই মারা গেছে। কোম্পানি বা সরকারি শ্রম দপ্তর কেউই এটা মানতে চাইছে না। ফলে তারা কোন ক্ষতিপূরণও দিচ্ছে না।

জাপানি সরকারের ঠিক করে দেওয়া নিয়ম বলছে যে—বেশী খাটা-খাটুনির ফলে মৃত্যু তখনই বলা যাবে যদি হতভাগ্য শ্রমিকটি মৃত্যুর ঠিক আগে 24 ঘণ্টা একটানা কাজ করে থাকে, অথবা প্রতিদিন 16 ঘণ্টা হিসেবে পর পর 7 দিন কাজ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

'91 সালের মে মাসে টোকিও হাইকোর্ট '77 সালে মৃত 'দাই নিপ্পন' কোম্পানীর এক মজদুরের ব্যাপারে রায় দেয়। হাইকোর্ট বলে 24 ঘণ্টার সিফটে কাজ করার ফলে সে মারা গেছে। ফলে 'দাই নিপ্পন' কোম্পানীই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী।

এক নিষ্ঠুর মজার ব্যাপার হল যে বাড়তি কাজের চাপের ফলে 'নিকোটিন' মেশান পানীয়র বিক্রি বেড়ে গেছে। মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর নিকোটিনের ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। বিক্রি বেড়ে যাওয়ার কারণ—বিক্রেতারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে 'এই সরবত খেলে কোন ক্লান্তির ছাপ ছাড়াই আপনি একটানা 24 ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন।' অন্যদিকে এই পানীয়র আসল ফল হল যে মাথার মধ্যে রক্তপাতে মৃত্যু বেড়ে গেছে।

কিছুদিন হল টোকিও থেকে ছাপা খবরের কাগজ 'আসাহি'তে একটা প্রবন্ধ বার হয়েছে। এই প্রবন্ধ বলছে যে একজন জাপানি মজদুর গড়ে খাটতে পারে মাত্র 15 বছর। মজা হল যে তার ওই 15 বছরের কাজের জীবনে সে কাজ করছে এক লাখ নয় হাজার ঘণ্টা। এটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্সের তুলনায় অনেক বেশী। 'আসাহি' লিখছে ওপরে বলা দুটো দেশে গড় হিসেব ছিয়াত্তর হাজার ঘণ্টা। একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে আমেরিকা বা ফ্রান্সে কিন্তু গড়ে একজন শ্রমিক কাজ করে 15 বছরের বেশী। তাহলে একজন জাপানি শ্রমিককে প্রত্যেকদিন কি ভয়ঙ্কর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আসলে এটাই হল নির্মম সত্য।

জাপানের রিসো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী হেদিও ফ্লাইইতর ব্যক্তিগত কথাবার্তায় জানিয়েছেন যে 1992 সালে যদিও কাজের ঘণ্টার মান সপ্তাহে 42 ঘণ্টায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সব জায়গায়ই অনেক বেশী সময় কাজ করার জন্য প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে। মজদুর নিরুপায়, জাপানে আজ পেট চালানর খরচা হু হু করে বেড়ে গেছে। লেখাপড়া আর থাকার জায়গার খরচা তো আকাশ ছোঁয়া। দুটো পয়সা (ইয়েন) বেশী রোজগার করার চেষ্টায় জাপানি মজদুর আজ দেহে মনে নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছে। আর এর ফল? চকচকে জাপানের কথা বলা বাবুরা শুনুন—চাঁদের উল্টো পিঠ হল প্রত্যেক বছর 20 থেকে 25 হাজার জাপানি শ্রমিক হঠাৎই অচেতন হয়ে পড়ছে কারখানার মাটিতে। জাপানি ভাষায় একে বলা হয় 'খারোসি' (Kharoshi)। এই শব্দটা জাপানে ব্যবহার করা হয় বাড়তি কাজ আর চাপের ফলে মৃত্যুকে বোঝাতে।

জাপানি শ্রমিকের সামনে আজ তাই এক বিরাট সমস্যা। তার দুর্বল হয়ে পড়া ট্রেড ইউনিয়নগুলোকেও ভাবতে হচ্ছে এসব নিয়ে।

আওয়াজ উঠছে রোবটের মত, যন্ত্রের মত, আর খাটব না। চাই মানুষের মত কাজ করতে।

** এই লেখাটি 'দি আদার সাইড অফ জাপানিজ ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধর ভাবানুবাদ। মূল লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বুলেটিন—অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি'র অক্টোবর ডিসেম্বর '91 সংখ্যায়। এটি একটি PRIA প্রকাশনা। □

বিজ্ঞান প্রযুক্তির স্বরূপ ও গণবিজ্ঞানের দিশার সন্ধানে

করবী রায়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ঘিরে বিতর্ক ও সংশয়ের ঝড় উঠেছে আজকাল। বিজ্ঞান মানেই প্রগতি, প্রগতি মানেই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দিয়ে কুসংস্কার ভাঙ্গার শপথ ছিল আমাদের ; অথচ ভাঙ্গতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বিজ্ঞান দিয়ে কেবল ভাঙ্গাই নয়, নতুন ধাঁচের, নতুন নতুন কুসংস্কার আবার গড়াও যায়। এহেন অবস্থায় সঠিক পথের সন্ধান কিভাবে করব আমরা ? ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে প্রথমে আধুনিক বিজ্ঞান বোঝবার চেষ্টা করলে গণবিজ্ঞানের সঠিক সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া হয়তো বা ক্রমশঃ সম্ভবপর হবে। গণবিজ্ঞানের দিশা সম্পর্কে কোন পরম সত্য উচ্চারণের উচ্চাশা এ লেখায় নেই ; এ দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়ায় রসদ যুগিয়ে চলার দায় আমাদের সকলের।

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্তর্দ্বন্দ্ব

অত্যাধুনিক বিজ্ঞান একান্তভাবেই পশ্চিমী সভ্যতার দান—এই প্রচলিত ধারণাটা সর্বতোভাবে সত্য নয়। প্রাচীনকালে, অর্থাৎ বুর্জোয়া সভ্যতার বিকাশের আগে পর্যন্ত, মানুষের মনে জ্ঞান আর বিজ্ঞানের সীমারেখাটা তেমন স্পষ্ট ছিল না। বস্তুগত জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সভ্যতা সে সময়ে নিজের নিজের সাফল্যের নজীর রেখেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের জ্ঞানের ভান্ডার ক্রমশঃ ভরে উঠেছে। তারপর ইউরোপে এসেছে বুর্জোয়া সভ্যতা তার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার শপথ নিয়ে। আজকের বিজ্ঞান, কিম্বা 'আধুনিক বিজ্ঞান' একান্তভাবে এই বুর্জোয়া সভ্যতার দান।

বিজ্ঞানের বিকাশের প্রাথমিক ধাপে ইউরোপে এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যা আর কোথাও ঘটে নি ? প্রায় হাল আমলে এমনকি আঠারো শতক পর্যন্ত, 'বিজ্ঞানীর' সঙ্গে 'জ্ঞানীর' কিম্বা 'পন্ডিতের' তেমন কোন ফারাক ছিল না। উনিশ শতকে এসে পন্ডিতের আর বিজ্ঞানীর কর্মকান্ড কিন্তু বিলকুল আলাদা হয়ে গেল। পন্ডিত যখন 'ঈশ্বর আছেন কি নেই ?' 'তিনি এক না বহু ?', 'সাকার না নিরাকার ?' এই জাতীয় ভারী জটিল সব প্রশ্ন হাতড়ে মরছেন, বিজ্ঞানী তখন 'দুই আর দুই কত হয় ?' জাতীয় প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল ভাবে চট করে কষে দিচ্ছেন। বিজ্ঞানীর জগৎ পরীক্ষাভিত্তিক সত্যের জগৎ ; হাজার জনের হাজার প্রকল্পের ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে নির্ভুল তত্ত্বের ঐক্য সেখানে ক্রমশঃ সমন্বিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মানুষের বিশ্বাস, ভালবাসা, মূল্যবোধের অফুরন্ত বৈচিত্র্য নিয়ে কারবার করেন যিনি, তিনি বিজ্ঞানী নন—তিনি 'অবিজ্ঞানী পন্ডিত'! বস্তুজগতের সঙ্গে ভাবজগতের এই প্রাথমিক বিচ্ছেদই বোধহয় 'আধুনিক বিজ্ঞানের' ইতিহাসে সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা। আর জন্মসূত্রে এ বিচ্ছেদ একান্তই ইউরোপীয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের মর্মমূলে দুটি তীব্র পরস্পরবিরোধী সত্তা আছে। এর একটি তার জ্ঞানের সত্তা, আর অন্যটি তার মতাদর্শের সত্তা। প্রথমটির অসাধারণ অবদান এবং নিছক বস্তুভিত্তিজনিত সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে সামগ্রিক জ্ঞানের জগতে তার যথাযথ সমন্বয় একান্ত কাম্য ; অন্যটি আজকের দিনে একান্তভাবে আগ্রাসী বুর্জোয়া শোষণের নির্লজ্জ ধারক—ভবিষ্যতের চোখে যা সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতাদর্শ—যন্ত্রসভ্যতার নক্সা

প্রত্যেক যুগ তার নিজের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী একটা নতুন মানসিক কাঠামোকে ক্রমশঃ খাড়া করে তোলে। তারপর বহুদিন ধরে মানুষের জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে মূলতঃ ঐ কাঠামোর যোগগুলোকে ধীরে ধীরে ভরে তোলার কাজই চলতে থাকে। ভরে যারা তোলে তারা অনেক সময়ই ভুলে যায় যে মূল নক্সাটা ঠিক এইরকম না হয়ে একেবারে অন্য ধাঁচেরও হতে পারত। এইভাবে কেটে যায় কয়েকশো কিম্বা কয়েক হাজার বছর। তারপর একসময় আসে সামাজিক টালমাটালের যুগ। প্রচলিত কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ক্রমশঃ মানুষের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মানুষ তখন খুঁজতে শুরু করে অন্য কোন কাঠামো, অন্য কোন জীবন, বিকল্প আর এক নক্সা।

আজকের যন্ত্রসভ্যতার প্রাথমিক নক্সাটা আঁকা হয়েছিল প্রায় 300 বছর আগে। এর মূলে ছিলেন ফ্রান্সিস বেকন (1561-1626) রেনে দেকার্তে (1596-1650) ও আইজাক নিউটন (1642-1727)। এই তিন দিক্‌পালের মানসিকতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তা ভাবনা কাজকর্মকে আজও কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

বেকন খুঁজতে চেয়েছিলেন এমন একটি "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি" যার জোরে মানুষের বস্তুভিত্তিক নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানকে (objective knowledge) ব্যক্তি বিশেষের ভাবনা চিন্তার জটিলতা থেকে সম্পূর্ণ-

অন্য চোখে রিও মহাসম্মেলন

সুরঞ্জন কর

খবরের কাগজে রিও সম্মেলন নিয়ে নানান লেখালেখির ওপর চোখ বোলাতে গেলেই প্রথম যে ব্যাপারটা চোখে পড়ে তা হোল আজকের দুনিয়ায় দেশগুলোর মধ্যে ভাগাভাগি বা জোট বাঁধাটা কেমন পাল্টে গেছে। ধরুন 'নর্থ' এবং 'সাউথের' লড়াইয়ের কথা। বা 'জি সেভেন এবং 'জি সেভেন্টিসেভেনের' মধ্যে মতবিরোধ। জি সেভেন্টিসেভেন—গরীব দেশের সরকারগুলোর জোট। এখন নেতৃত্বে আছে পাকিস্তান সরকার। আবার শুধু যদি দেশ ধরে ধরে হিসেব করা যায় তবে জি সেভেনের মধ্যেও তিন পক্ষের স্বার্থের লড়াই আছে। আমেরিকা এক পক্ষ। জাপান আর এক। রইল বাকি ইউরোপের দামী দেশগুলো ; যথা ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যণ্ড আর ইটালি। তারা ই সি (ইউরোপিয়ান কম্যুনিটি) ভুক্ত দেশ হিসেবে এক ছাতার তলায় দাঁড়িয়েছে। এরা যেমন আলাদা আলাদা, আবার গরীব দেশগুলো কিন্তু এদেরকে এক সাথেও দেখছে। যেমন বড়লোক দেশ মানে 'নর্থ' আর গরীব দেশ মানে 'সাউথ'। 'সাউথ' অভিযোগ আনছে 'নর্থের' বিরুদ্ধে যে পৃথিবীতে প্রতি 100 জনে তোমাদের লোক 16 জন। অথচ তোমরা মোট খাবারের 60 ভাগ খেয়ে ফেলছ। মোট শক্তির 70 ভাগ তোমরা খরচা করছ। মোট শিল্পে ব্যবহারের কাঠ 80 ভাগ নিয়ে নিচ্ছ। কাজেই তোমরা পরিবেশ ধ্বংসের জন্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশী দায়ী।

এই সব কথা তো পরিবেশ আন্দোলনেরই কথা। খাঁটি কথা। গরীবদেশের শহর কলকাতায় বসে খবরের কাগজে পড়তে ভালই লাগে। এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। সেটা হল একটা দেশ, তার সাধারণ মানুষ এবং দেশের সরকারের মধ্যে তফাতটা।

পরিষ্কার করে বলতে পারলাম না হয়ত তাই আর একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি। ধরুন 'আর্থ' সামিট' বা পৃথিবী নিয়ে শীর্ষ সম্মেলন, যার একটা পোশাকি নাম আছে—'ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্স অন এনভায়রণমেন্ট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট'। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ডাকে পরিবেশ আর উন্নয়নের ওপর জরুরী এই মহাসম্মেলন হয়ে গেল জুন মাসের শুরুতে ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল দেশের মস্ত শহর রিও ডি জেনিরোতে। এই সম্মেলন সরকারি সম্মেলন। অর্থাৎ 185 টি দেশের মন্ত্রী ও আমলারা এক জায়গায় এলেন (প্রায় 160 টি দেশের সরকারের প্রধানরা যোগ দিয়েছিলেন এখানে)। বুঝতেই পারছেন কি বিশাল ব্যাপার! শোনা গেছে যে এর প্রস্তুতিতেই নাকি আড়াই কোটি কাগজের পৃষ্ঠা খরচা হয়েছে। শুধু ভারত থেকেই প্রায় এক টন সরকারি নথিপত্র গেছে রিওতে। (এছাড়া গেছেন বড়-মেজো-সেজো নানান দপ্তরের কর্তারা। কংগ্রেস সাংসদ মণিশঙ্কর আয়ার-ও এ নিয়ে ঠাট্টা করে তাঁর লেখার শিরোনাম দিয়েছেন 'বাবুক্রেসি'।) এই মহাভারত নিয়ে চর্চা করে শেষ পর্যন্ত তিনটি অংশে বিষয়গুলিকে ভাগ করা হয়। একটি হল গ্রীণ হাউস গ্যাস বেরোন এবং অন্যান্য নানান কারণে পৃথিবীর গরম হয়ে ওঠা ও তার থেকে আওহাওয়ার পরিবর্তনকে আটকানর প্রস্তাব (ক্লাইমেট চেঞ্জ কনভেনশন)। দ্বিতীয়টি হল পৃথিবীতে যে নানান ধরণের গাছ, পোকা-মাকড়, জীবজন্তু (জানা গেছে প্রায় 14 লক্ষ প্রজাতির পরিচয়। আরও 80 লক্ষ থেকে 8 কোটি প্রজাতি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতে) প্রভৃতি আছে তাদেরকে বাঁচান সংক্রান্ত চুক্তি (বায়োডাইভার্সিটি ট্রিটি)। তৃতীয় বা শেষ বিষয় ছিল স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে জঙ্গল বাঁচান অবধি 1155 টা প্রোগ্রামের একটা মোটা দলিল (গোড়ায় আটশ পাতা থেকেপরে সেটাকে কমিয়ে আনা হয় পাঁচশয়)—যাকে 'অ্যাজেণ্ডা টুয়েন্টি-ওয়ান' নাম দেওয়া হয়।

স্বাভাবিক নিয়মেই ইরাক যুদ্ধ বিজয়ী আমেরিকাও এই সম্মেলনে প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য দেখায়। তারা বায়োডাইভার্সিটি চুক্তিতে সই করতে রাজী হয় না। 'ক্লাইমেট চেঞ্জ' প্রশ্নে প্রস্তাব বদলে দিতে চায় এবং অবস্থাটা এমনই দাঁড়ায় যে অন্যান্য বড়লোক দেশগুলোর সরকাররাও আলাদা অবস্থানে চলে যেতে থাকে।

কিন্তু এসবই তো বহুল প্রচারিত খবর। যেমন খবর মালয়েশিয়ার পরিবেশ প্রেমী প্রধানমন্ত্রী মহাথির মহম্মদের চড়া সুরের বক্তৃতা—যে বক্তৃতা গরীব দেশের ওপর ধনী দেশের চেপে বসার বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী ধিক্কার। আসল প্রশ্ন হল লড়াইটা কি নিয়ে? এক কথায় যার উত্তর হল টাকা-পয়সা, ইংরজীতে যাকে বলব 'ফাণ্ড'।

প্রশ্নটা একটু বড় করে দেখা যাক। আমি শুরু করছি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বুত্রোস বুত্রোস ঘালির কথা দিয়ে। রিও সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে ঘালি বলেন যে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ধ্বংসের ক্ষেত্রে 'যে দায়ী তাকেই পয়সা দিতে হবে।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে

কোথাও প্রয়োজনের বেশী উন্নয়ন হয়েছে, কোথাও বা কম এবং দুটোই ক্ষতিকারক। তিনি আরও বলেন সামরিক খাত থেকে টাকা পয়সা সরিয়ে আমাদের গ্রহের উন্নতি আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে উন্নত দেশগুলোকে প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করতে হবে গরীব দেশগুলোকে।

কথাগুলোর যুক্তি কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না সাধারণ-ভাবে। এই প্রশ্নেই তাই চেপে ধরা হয়েছে বড়লোক দেশের সরকার-গুলোকে। এমনকি বিশ্বব্যাংকও বলছে যে পরিবেশ বাঁচিয়ে উন্নয়ন করতে হবে। বিশ্বব্যাংক এও বলছে যে আমাদের গ্রহ যে ভয়ঙ্কর পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যায় ডুবতে বসেছে তার খরচা 'উন্নত' দেশগুলোরই দেওয়া উচিত, টাকার অংকে যা বছরে প্রায় 100 বিলিয়ন ডলার দাঁড়াবে। পরিবেশ রক্ষায় বিনিয়োগও করতে বলছে ব্যাংক। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 1992 অনুযায়ী বিনিয়োগের আনুমানিক হিসেব হল যে তা 75 বিলিয়ন ডলারে উঠতে পারে। আমেরিকার গণমাধ্যম বলছে যে তৃতীয় বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার জন্য চাইছে 125 বিলিয়ন ডলার। কিন্তু বড়লোক উন্নত দেশগুলোর পকেট থেকে 6 বিলিয়ন ডলার বের করাই ভাগ্যের ব্যাপার।

ফলত আর্থ সামিটে গরীব দেশের সরকারগুলো প্রায় আন্দোলনে নেমে পড়ে। তাদের ভাষাও হয়ে ওঠে আন্দোলনের ভাষা। আর এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্নটা আরও স্পষ্ট চেহারা নেয়। সরকারে সরকারে লড়াই হচ্ছে। গরীব দেশের সরকার গরীব আদিবাসী, কৃষক, নানান নিপীড়িত মানুষের ভাষা, তাদের সংগ্রামের আওয়াজ নিজেদের গলায় তুলে নিচ্ছে। তারা টাকা পেলে পরিবেশের সাথে বন্ধুত্বের পথে উন্নয়ন করবে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবসা জমে উঠবে। দেশী কোম্পানী, আর তার বড়দাদা বিদেশী কোম্পানী 'পরিবেশ যন্ত্রপাতি' বেচবে। যেমন মোটর গাড়ী বা কারখানার চিমনিতে কালো ধোঁয়া বন্ধ করার মত দামী যন্ত্র, 'নিরাপদ' পারমাণবিক চুল্লি। আমাদের প্রশ্ন—সব থাকবে আর আমরা ইউরোপ-আমেরিকা হয়ে উঠব শুধু কিছু কিছু নতুন টেকনলজি বসিয়ে? আমাদের দেশে কোন প্রকল্প কি ভাবে হচ্ছে আজকাল সে তো অনেকেই জানেন। ধরুন জল দূষণমুক্ত করার বড় কোন 10 কোটি টাকার প্রকল্প শুরু হল। জনে জনে কমিশন দিয়ে আসল কাজ কতটুকু হবে? কণ্ট্রাক্টর কত নেবে?—এ তো গেল একটা দিক। অন্য খুব বড় জরুরী দিক হল কে ঠিক করবে প্রকল্পটা কেমন হবে? অল্প কিছু আমলা—বিশেষজ্ঞ আর যে গরীব নারী-পুরুষ জলদূষণের শিকার, তাদের মতামত কে নেবে? তারা কি ভাবে অংশ নেবে, নিয়ন্ত্রণে রাখবে এই সব কর্মোদ্যোগ?

এই পথে এগোনর কোন চেষ্টা কি রিও সম্মেলনের মঞ্চ থেকে করা সম্ভব ছিল? আর এইখানেই তৈরী হয়ে ওঠে আর একটি প্রশ্ন। সেটি উন্নয়নকে ঘিরে। উন্নয়নের একটিই ছবি এখানে আসছে। সেটি হল ইউরোপ-আমেরিকা হয়ে উঠতে চেষ্টা করা। গরীব দেশের হয়ে গরীব দেশের সরকার বলছে 'আমাকে টাকা দাও। আমি ফাইল—লালফিতে-টেণ্ডার-কণ্ট্রাক্ট এই পথে উন্নয়ন করব। তুমি যা হয়েছ তা হয়ে ওঠা থেকে তুমি আমায় আটকাতে পারনা'। অন্যদিকে আকাশের ওজোন স্তরে ফুটো, পৃথিবীর গরম বেড়ে সমুদ্রের ধারের জনপদ নিশ্চিহ্ন হওয়ার, আশঙ্কা নিউক্লীয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষাক্ত তেজস্ক্রীয়তা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়া এসবই তো ইউরোপ-আমেরিকার উপহার।

তবে এইখানেই আবার সরকারও তার কাজকর্মের সাথে দেশ ও দেশের মানুষকে এক করে দেখার প্রশ্নটি ফিরে আসছে। আসলে আমার মনে হয় প্রশ্নটা নানান স্তরে আছে। ধরা যাক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটের কথা। তাঁরা বলছেন আমেরিকানরা বছরে 1800 কোটি বাচ্চার 'ডায়াপার' আর যে পরিমাণ অ্যালু-মিনিয়ামের কৌটো ফেলে দেন তা দিয়ে 6000 জেটপ্লেন তৈরী হয়ে যেতে পারে। বড়লোক দেশের একজন লোক নাকি গরীব দেশের একজনের তুলনায় 15 গুণ বেশী কাগজ, 10 গুণ বেশী ইস্পাত আর 12 গণ বেশী জ্বালানী ব্যবহার করে। তাঁরা বলছেন গরীব দেশগুলোতে নিচের তলার 63 কোটি নারী-পুরুষের খাওয়া দাওয়া প্রায় 'না' এর ঘরে ঘরে এসে ঠেকেছে। এর ওপরের 340 কোটি মানুষ, যাঁদের মধ্যে মধ্যবিত্তরাও পড়েন তাঁদেরও শাক-পাতার ওপরই টিঁকে থাকতে হয়। পাশাপাশি আমেরিকানদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট লাল মাংস—যার এক পাউন্ড পেতে পাঁচ পাউন্ড শস্য খাওয়াতে হয় পশুটিকে।

তাঁরা আরও বলেছেন নতুন আমেরিকান গাড়ীগুলোর দশটার মধ্যে নটাই এয়ার-কণ্ডিশনড। এরাও পৃথিবীকে আরও গরম করে তুলছে। প্রশ্ন তুলছেন এমনকি 'পটেটো চিপস' খাওয়া নিয়েও। কারণ আলু থেকে 'পটেটো চিপস' বানাতে অপচয় হয় এক বিশাল শক্তি।

এইসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারা তাঁদের বক্তব্য নিয়ে এসেছিলেন রিওতে। ফ্ল্যামেঙ্গো পার্কে 'আর্থ সামিটে'র পাশাপাশা তাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব মঞ্চ, নাম—'গ্লোবাল ফোরাম'। এঁরা অনেক সুন্দর তথ্য তুলে ধরেছেন। বিক্ষোভ দেখিয়েছেন জর্জ বুশের বিরুদ্ধে। ওয়ার্ল্ড ওয়াচ তো বলছেনই যে 'এক সহজ সরল জীবন যাত্রা চাই'। এসবই তো সঠিক কথা। যারা কিনছে এঁরা তাদের দিকটা দেখছেন। তাদের বদলাতে বলছেন। কিন্তু যদি বিক্রেতাদের দিকটা দেখা যায়, যারা বেচছে! টিভি, ফ্রীজ, ওয়াশিং মেসিন একদিকে। অন্যদিকে নানান অস্ত্র, কীটনাশক থেকে শুরু করে অজস্র পেট্রো-কেমিক্যালস্ প্রোডাক্ট। আরও কত কি? সরকারের মুখ দিয়ে পৃথিবীব্যাপী ব্যবসাই কথা বলে ওঠে না কি? আগে পরিবেশ-বিপদ ততটা ছিল না। পৃথিবীকে নিঃশেষ করে কাঁচা মাল থেকে অবিরত জিনিষপত্র তৈরী করতে করতে যখন সর্বনাশের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সবাই তখনই আওয়াজ উঠল 'পরিবেশ বাঁচিয়ে উন্নয়ন কর'। এই ব্যবসা তখন কি চাইবে না এই নতুন দিকও তার কুক্ষিগত

হোক? সে কি চাইবে না যে পরিবেশের সমস্ত কণ্ট্রাক্ট বিশেষ করে গরীব সরকারগুলোর কাছ থেকে সেই-ই পাক! আর তা যদি সম্ভব করতে হয় তবে উন্নয়নটা হবে একই রকম, শুধু তারই তৈরী সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানায় সেই-ই বসাবে নতুন দূষণবিরোধী যন্ত্র। তৈরী করবে নতুন শক্তি বাঁচান চকচকে গাড়ীর মডেল। আর এইসব লুটের অধিকার টিঁকিয়ে রাখতে গেলে টাকার যাতায়াত, সরকারি পদ্ধতি এসব ব্যাপারে হাত দেওয়া চলবে না। পরিবেশের প্রশ্নটাকে মানুষের জীবনের জায়গা থেকে সরিয়ে এনে বলতে হবে 'এ সবই টেকনিক্যাল প্রশ্ন'।

অথচ শুধু টেকনিক্যাল দিকগুলো বলেও আমেরিকান সরকারকে রাজী করান যায় নি রিওতে কোন ছাড় দিতে। কারণ ছাড় দিতে হলে হয়ত ব্যবসার গায়ে লাগবে! ব্যবসা—যার হাত উত্তর পার হয়ে দক্ষিণের কোণে কোণে প্রসারিত। এই সুতো ধরেই হয়ত ভারতীয় ব্যবসার মুখপাত্র 'ফিকি' ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজও রিও সম্মেলন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠান গুলোর সবুজ হয়ে ওঠার কথা বলেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছে নতুন 'সবুজ ব্যবসা' নিয়ে পৃথিবীর বাজারে ঢোকার কথা।

অর্থাৎ ব্যবসা, বাজার এসব ঠিক থাকবে—শুধু জুড়বে পরিবেশের ভারসাম্য টিঁকিয়ে রাখার কথা।

একটা স্তরে রয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউ এন ও, বড় রাষ্ট্রের সরকার, অন্য স্তরে রয়েছে ফিকি, ছোট রাষ্ট্রের সরকার, এরা। সতর্ক হয়ে দেখা দরকার কে কি বলছে, কে কি করছে।

শুরু করার জন্য এইটুকুই শুধু বলা যায়, যে পরিবেশ বাঁচান, পৃথিবীকে বাঁচানর প্রশ্নটা অনেক বড় মাপের। পরিবেশ দূষণ, সামাজিক দূষণ সবই একসাথে বোনা রয়েছে নানান সুতোয়। দূষণের সবচেয়ে বড় শিকারই হল গরীব নারী-পুরুষ। সেদিক থেকে ব্রাজিল দেশকে বাছাটা খুবই শিক্ষাপ্রদ, কেন না সে দেশেই রয়েছে বিলাসবহুল চকচকে শহরের মধ্যেই গরীবদের নোংরা, গাদাগাদি করে থাকা, বস্তিনগর। কংগ্রেস সাংসদ আয়ার দেখেছেন রিওর রাস্তায় সন্ধ্যের পর মেয়েদের নেমে আসতে দুটো ডলারের আশায়। গুজব শুনেছেন যে রাস্তার বাচ্চাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খুপরি অন্ধ গলিতে যাতে তারা পৃথিবী বাঁচাতে আসা বড়কর্তাদের চোখের সামনে পড়ে বিব্রত না করে দেয়। আয়ার এও শুনেছেন যে যারা যেতে চায়নি তাদের নাকি গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছে।

হ্যাঁ, আয়ার, আপনি ঠিকই শুনেছেন। ব্রাজিলের শহরগুলোর রাস্তায় থাকতে বাধ্য হয় অসংখ্য বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা। আর তাদের যে গুলি খেয়ে বা অত্যাচারিত হয়ে মরতে হয় তাও ঠিক কথাই।

আর এইখানে এসেই আমাদের মনে তৈরী হয় এক গভীর অস্বস্তি। 'শিশুদের জন্য পরিচ্ছন্ন পৃথিবী'র পোস্টারের তলায় দাঁড়িয়ে আমাদের মনে তৈরী হতে থাকে অনেক অনেক প্রশ্ন। □

মুদিয়ালীতে আন্দোলনরত মানুষের পাশে দাঁড়ান

তারাতলা হাইড রোডের কারখানা এলাকার ধুলো ধোঁয়ার মধ্যে রয়েছে একটুকরো দুর্লভ সবুজ। নাম নেচার পার্ক। মুদিয়ালী ফিসারিজ সমবায়ের তৈরী আটটা জলাশয় আর এক লক্ষ গাছের এই সুন্দর প্রকল্প আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। জমির মালিক ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট আজ জলা বুজিয়ে ফেলতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা আজ খুব প্রয়োজন। এর প্রথম ধাপ হল এই প্রকৃতি উদ্যানকে জানা। এখানকার মানুষদের পাশে দাঁড়ান। তাই আমরা চাই এ ব্যাপারে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা।

বসুন্ধরা বৈঠক

পরিবেশ নিয়ে নেতাদের কথা বলার অধিকার আছে কি ?

মেধা পাটকার

[লেখিকার মতে রিওর 'পৃথিবী বাঁচানোর' বৈঠক প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। বসুন্ধরা বৈঠকের নামে যা ঘটল তাকে খুঁটিয়ে দেখা ও এসব নিয়ে চারদিকে বিতর্ক তোলা আজ খুবই জরুরী, তাঁর মতে উন্নয়নের নামে আজ যা ঘটছে তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।]

1992 এর জুনে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে যে বসুন্ধরা বৈঠক হয়ে গেল, তা থেকে এটুকু অন্তত স্পষ্ট হ'ল যে পরিবেশ ব্যাপারটা আজ যেমন জটিল তেমনই জরুরী। আর এ নিয়ে বিতর্ক বিতর্ক খেলাও যে কত জমে উঠতে পারে তার প্রমাণও ঐ রিওর বৈঠক।

পরিবেশ শব্দটার মধ্যেই যে এত ঝগড়াঝাঁটি লুকিয়ে আছে তা আগে জানা যায় নি। পরিবেশ দূষণের জন্য পৃথিবীর উত্তরের উন্নত দেশের নেতাদের সাথে দক্ষিণের গরীব অনুন্নত দেশের নেতাদের একে অপরকে দায়ী করার, একে অন্যের দোষ ধরার এরকম ঘটনার ব্যাপকতা এই প্রথম।

তথাকথিত পৃথিবী প্রেমিকরা, মূলতঃ সরকারী মাতব্বররা চুক্তির পর চুক্তি, সন্ধি ইত্যাদি করলেন। ঝোলাভর্তি কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে ভারী ভারী বিষয় আলোচনা হ'ল। কিন্তু তা দিয়ে পরিবেশ সমস্যায় ধারে কাছে যাওয়ারও চেষ্টা হল না, কোন্ মানুষগুলো পরিবেশকে ধ্বংস করছে, কোন্ ধরণের রাজনীতি পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে ওঠার জন্য দায়ী এসব নিয়ে কোন আলোচনাই হল না। কেউ একবারও বলল না পৃথিবীর অগুনতি সেইসব আদিবাসীদের কথা যাদের সঙ্গে পরিবেশের যোগাযোগ সব থেকে বেশী। যারা নিজেদের প্রয়োজনেই পরিবেশকে এতদিন ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। যাদের কাছে পরিবেশ ধ্বংস করা মানে নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনা। পরিবেশের বিষয়গুলো নিয়ে আগে থেকে তৈরী গুচ্ছের ভারী ভারী শব্দের পক্ষে বা বিপক্ষে নেতারা তাদের মতামতটুকু জানিয়েই রিও থেকে ল্যাজ গুটালেন। তাদের কথাবার্তায় কোন নতুন পথের খোঁজ পাওয়া গেল না। অথচ ভাবটা এমন দেশবাসী যখন পাঠিয়েছেন তখন তারা হেস্তনেস্ত কিছু একটা করে ছাড়বেনই। পৃথিবী বাঁচানোর যুদ্ধে কোন শক্তির কাছেই মাথা নত করবেন না।

বসুন্ধরা বৈঠকে পৃথিবীর আবহাওয়ার এখনকার অবস্থা নিয়ে কাজিয়া হল। দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার বদলে দর কষাকষি চলল, পৃথিবী বাঁচানোর তহবিলে কার সবচেয়ে কম দেওয়া উচিত এ প্রশ্ন নিয়ে। পৃথিবীর পরিবেশকে কে কত বেশী ধ্বংস করেছে এ নিয়েও নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা চলল। নেতারা লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়ে একে অপরকে দোষী করার চেষ্টায় মেতে উঠলেন। কে কত বেশী শক্তিমান বিভিন্নভাবে তাও তারা বোঝাতে ছাড়লেন না। আসলে রিওতে চমক লাগানো আলোচনাসভার ব্যবস্থা করে সরকারী পরিবেশ-বিদরা পরিবেশের তর্কবিতর্কগুলোকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগালেন। আর এসবের মধ্য দিয়ে চালাকি করে কিছু অপ্রিয় প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। তারা মুখ ফসকেও বিকল্প উন্নয়নের পথ খোঁজার কথাটুকুও বললেন না। পরিবেশের প্রধান সমস্যাগুলো কি কি? তার কারণগুলো কি কি? পাহাড়-বন-জলার মানুষকে তাদের ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে উন্নয়নের নামে আজ যা চলছে তা পাল্টানোর কেন প্রয়োজন? প্রকৃতিই যাদের রুটিরুজির একমাত্র ভরসা, পৃথিবীর সম্পদে তাদের অধিকার কতটুকু? এসব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললেন না।

পৃথিবী বাঁচাতে হলে জলা-জঙ্গলের সম্পদের উপর দলিত আদিবাসীদের অধিকার যে ফিরিয়ে দিতেই হবে, জল-মাটি-বায়ুকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে ঐসব মানুষদের কাছ থেকেই যে আজ অনেক কিছু শিখতে হবে এসব নিয়ে কেউ কিছু বললেন না। আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমালোচনা হল না।

অথচ আজকের বিজ্ঞান-কারিগরী বিদ্যা দিয়ে যেভাবে মানুষের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা চলছে তা থেকেই তো বাতাস-মাটি-জল বিষাক্ত হচ্ছে। জঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে, অসংখ্য মানুষ তাদের রুটি-রুজি ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের দরকারী গাছপালা-পশুপাখী

দিনের পর দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। অদরকারী বহু জিনিস তৈরী করা হচ্ছে। রিওর বৈঠকে এসবের স্বপক্ষে একটা কথাও বলা হল না, উল্টে আজকের প্রযুক্তিকে, উন্নয়নের এখনকার পথকেই সমর্থন করা হল। মানুষ ও পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর এই উন্নয়নের ধারাই যাতে আগামী দিনেও বজায় থাকে, পরিবেশ নিয়ে ভারী ভারী শব্দের আড়ালে তারই চেষ্টা করা হল।

আমেরিকা-ফ্রান্স-বৃটেনের মত উত্তরের উন্নত ধনী দেশগুলো পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য, জীবজগতের ক্ষতির জন্য যদি দোষী হয় তাহলে ভারত ব্রাজিল আফ্রিকার মত দক্ষিণের অনুন্নত গরীব দেশগুলোও কি একই দোষে দোষী নয়? এসব দেশেও কি একই ধরণের কল-কারখানা বসিয়ে দেশের উন্নতি করার চেষ্টা হচ্ছে না? ওদের যদি দূষণ ছড়ায় আমাদেরটা নিরাপরাধ তবে কি করে? এখানেও তো লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভিটে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে উন্নয়নের নামে যা খুশী তাই করা হচ্ছে। এই ধাঁচের উন্নয়নই তো উত্তর-দক্ষিণ সবখানেতেই ক্ষমতালোভী, স্বৈরাচারী নেতাদের টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে, বড়লোককে আরো বড়লোক করছে। আমাদের নেতাদের আশা আকাঙ্খা রাজনীতি সবই কি উত্তরের নেতাদের মতই না? তবে আর ওদের সাথে আমাদের পার্থক্য কিসে? দূষণের জন্য দোষীতো সব নেতাই।

রিওর বৈঠকে দক্ষিণের নেতারা যদি উত্তরের উন্নয়নের পথের সমালোচনা করত, যদি সত্যিকারের বিকল্প উন্নয়নের একটা ধারণা দিতে পারত, একটা দৃষ্টান্ত খাড়া করতে পারত তাহলে, এ বৈঠক থেকে হয়তো বা কিছুটা ফলের আশা করা যেত। অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে দক্ষিণের দেশগুলো যদি উত্তরের উন্নয়নের পথ বাদ দিত, যদি নিজেদের তৈরী বিকল্প পথে চলবার সাহস দেখাত তাহলে পরিবেশ ও মানুষের উপকার হত। এ থেকেই হয়তো উত্তরের শাসকদের গদি টলত, সাধারণ মানুষের দুঃখের দিনের শেষ হত, পৃথিবী বাঁচত।

পরিবেশবাদীতার সংজ্ঞাও যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম হতে পারে পরিবেশবাদী, লোকজন ও যে ভালখারাপ সবরকমই হতে পারে সে সম্পর্কে সজাগ হওয়ার প্রয়োজন এসেছে। রাজাবাদশার পরিবেশবাদ বা সরকারী পরিবেশবাদ যে কতখানি ভাঁওতাবাজি তা না জানলে পরিবেশ আন্দোলনের সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে, অন্যায় ভাগ বাঁটোয়ারা চলতেই থাকলে কিছু শক্তিশালী মানুষের হাতে পৃথিবীর সম্পদ একতরফাভাবে শুধু লুঠই হবে, পরিবেশকেও ধ্বংস করবে।

প্রতিটি পরিবেশ প্রেমীকে তাই আজকের উৎপাদন ব্যবস্থা, ভোগবাদীতা ও অসম বণ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ করতে হবে। তা না হলে পরিবেশবাদীতা কোন দিনই সামাজিক রাজনীতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারবে না। এই অন্যায় উন্নয়নের পথকে পরিবর্তন করতে পারবে না। পরিবেশ আন্দোলন কিছু ধোপদুরস্ত বাবু মানুষের ফ্যাসন হয়েই থাকবে, বুদ্ধিজীবীদের অলস সময় কাটানোর সংস্কৃতি হিসেবেই থেকে যাবে।

সত্যিকথা বলতে কি ভারত তথা সারাদুনিয়ায় পরিবেশবাদীতা একটা রাজনৈতিক দর্শন হিসেবেই ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। এখানে পরিবেশবাদীরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন (লাল) ও পরিবেশবাদী দলগুলোর (সবুজ) কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিবেশবাদী সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য ও সম্ভাবনা গুলোকে জেনে বুঝে উন্নত করবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

নর্মদা ভাগীরথী সুবর্ণরেখা থেকে আমাজন, জেমসবেতে, কাকরাপারের পরমাণু কেন্দ্র থেকে বালিয়াপালের ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটিতে সবখানেই মানুষের লড়াই চলছে মূলতঃ মাটি জল ও বনজসম্পদে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য। মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই বেঁচে থাকে। প্রকৃতি ও মানুষের গভীর সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রেখে একটা মানবিক প্রকৃতিমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলবার ও সমান অধিকারের আওয়াজই শোনা যাচ্ছে সবজায়গায়। এছাড়া পৃথিবীর পরিবেশকে বাঁচানো সম্ভব নয়।

বসুন্ধরা বৈঠকের মত কোন বৈঠকই পরিবেশ সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পারবে না। বরং সত্যিকারের সমস্যা ও সমাধানের দিকে চোখ ফেরাতে না দিয়ে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই করবে। তাই পরিবেশ নিয়ে এধরণের আন্তর্জাতিক চমক লাগানো বৈঠক ও লোকভোলানো চুক্তিগুলোকে জানা-বোঝা ও বিতর্ক তোলা আজ খুবই জরুরী। জনমুখী পরিবেশ আন্দোলনের আজ এটা একটা অন্যতম দায়িত্ব বলা যেতে পারে। □

[ভাবানুবাদঃ শান্তনু ত্রিবেদী]

বিতর্ক সভায় আসুন

বিষয়ঃ ভারতে পরমাণুশক্তির প্রয়োজনীয়তা
22শে আগস্ট '92 শনিবার বেলা দুটো
বি আই টি এম অডিটোরিয়াম
উদ্যোক্তাঃ সেফ এনার্জি এণ্ড এনভায়রমেণ্ট এবং বি. আই. টি. এম.

বজবজে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আমাদের বিপদ

বিজয় সরকার

বজবজ এক নং ব্লক গ্রাম পূজালি, রাজীবপুর, রঘুনাথপুর, রাজারামপুর, আছিপুর, রামচন্দ্রপুর, নিশ্চিন্তপুর, জগৎবল্লভপুর আর কালীপুর। সিইএসসির 500 মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য এই ন'টি গ্রামের লোকেদের ভিটেমাটি চাষজমি চলে যেতে বসেছে। এ হিসাব দিয়েছেন পূজালী গ্রাম সংগ্রাম কমিটি—সিইএসসির প্রস্তাবিত এলাকার মানচিত্র অনুযায়ী। তাদের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী এখন তারা 330 একর জমি অধিগ্রহণ করবে। পূজালী মৌজায় 42.5 একর জমি সরকার ইতিমধ্যেই খাসজমি ঘোষণা করে তাতে খুঁটি পোতার জন্য লাঠি গুলি টিয়ারগ্যাসের পিছনে অনেক খরচ করেছে। বাস্তবে, হিসেব মত এই তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে আরও 700 একর জমি লাগবে কেননা সাঁওতালডিতে শুধু প্রকল্পের জন্য 1000 একর জমি লেগেছে যদিও তার লক্ষ্যমাত্রা 480 মেগাওয়াট। পূজালি গ্রাম বড়, ঘন বসতিপূর্ণ, প্রায় 22000 লোকের বাস। সব মিলিয়ে ঐ ন'টি গ্রামের 70 হাজার লোক ঘরভিটে, চাষের জমি, হারাবে। একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, 12 টি প্রাইমারী স্কুল, ছ'টি মিডল্ হাইস্কুলও নিরুদ্দেশের তালিকায় থাকবে। বন্ধ হবে 30 টি ইট ভাঁটা। যাতে যুক্ত থাকে অন্যান্য প্রদেশের প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক—বছরের 8-9 মাসের জন্য। সেগুলিও বন্ধ হবে। তার বদলে কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চল 500 মেগাওয়াট বিদ্যুত পাবে বলে সরকার ও সিইএসসি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন।

যে এলাকাটির কথা হচ্ছে তা শিয়ালদহ থেকে 32 কিমি দূরে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে 25 কিলোমিটার, বোটানিকাল গার্ডেন থেকে 20 কিমি আর কোলাঘাট থেকে 25 কিলোমিটার যেখানে আর একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, আর মন্ত্রিদের কাছাড়ি থেকে 28 কিলোমিটার। যে জমিগুলো প্রথমকিস্তিতে দখলের জন্য পুলিশ-পাহারায় রাস্তায় নোটিশ ছুড়ে ছুড়ে 'বিলি' করা হয়েছে সেগুলি দু-তিন ফসলি জমি দুটো ধান, সব্জি—পরিবেশ মন্ত্রকের সংজ্ঞানুযায়ী Prime agricultural land। পূজালি যেতে গেলে শিয়ালদহ বজবজ লাইনের নুংগি স্টেশনে নেমে আছিপুর বাসে দক্ষিণ দিকে যেতে হবে। বাস মিনিবাস দুই পাবেন। বজবজ পার হয়ে 6 কিলোমিটার।

পূজালির বাসিন্দাদের শতকরা 75 ভাগ কৃষিজীবি। শতকরা 5 জন মৎস্যজীবি। গংগায় ভালো ইলিশ আসে, তা ছাড়াও নানা মাছ ধরা পড়ে। আছে বিরাজলক্ষ্মী স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এটিও অধিগ্রহণ হবে। এর জমিটি খাস কিনা সরকার এখনও জানাননি।

তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটি করবে সিইএস্সি—মালিক গোয়েঙ্কারা। লাগবে এখনও পর্যন্ত দেখানো হিসেবে—1800 কোটি টাকা। এই টাকা তারা নিজেরা লগ্নী করবেনা [উৎসমানুষ, ফেব্রুয়ারী 1992] তারা টাকা ধার করবে আন্তর্জাতিক পুঁজিসংস্থা এশিয়ান ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংক থেকে। এর জন্য তারা কারখানার সম্পত্তি মায় সরকারের কাছে লাইসেন্স পাওয়া জমি বন্ধক রাখবে। বামফ্রণ্ট সরকার তাদের জমি দেবে, (জমি ভোগ যায় বন্ধক দেবার লাইসেন্স সহ) এবং এই জমি আসবে প্রায় লাখখানেক লোককে উচ্ছেদ ও সর্বস্বান্ত করে।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে আসা যাক। সাঁওতালডিতে জমির দলিল যাদের ছিল তাদের জমির মাপ হিসেবে দাম ও প্রতি পরিবারে একজন করে চাকরীর প্রতিশ্রুতি ছিল। কিছু জায়গায় 'মুদি' সম্প্রদায়ের কিছু লোককে এনে অধিগ্রহনের আগে বসিয়েছিল সম্পন্ন জোতদার হারাধন মাহাতো। তাদের কোন পাট্টা ছিলনা। তাই উচ্ছেদ হলেও তারা ক্ষতিপূরণ পায় নি। যাদের পাট্টা ছিল 1952'র দরে (সরকার কর্তৃক ঠিক করা) ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে পেতে কুড়ি পঁচিশ বছর। তাও 'বাহাল' জমি 'কাজালির' দরে আর 'কাজালি' জমি 'বাহিদে'র দরে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া চাকরির অধিকাংশ পরিবারই পায়নি। হলদিয়া বন্দর প্রকল্পে যারা উচ্ছেদ হয়েছিল তারা পূজালিতে বলে গেছে তাদের কি হাল—তারা ক্ষতিপূরণের টাকাও পায়নি, পুনর্বাসনও হয়নি অনেকেরই। তাই পূজালীর লোকেদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে কোন মোহ নেই। তারা ধরেই নিয়েছে হয় লড়াই করে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বসাতে তারা দেবেনা, না হলে তাদেরকে হুগলী নদীতে ডুবেই মরতে হবে।

ওখানে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প হলে কত বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে? সাঁওতালডিতে 480 মেগাওয়াটের প্রকল্পে চারটে ইউনিট—প্রত্যেকটি 120 মেগাওয়াট, একটিতো দীর্ঘদিন ধরে বসে গেছে। সরকার যাই ঘোষণা করুন একজন গবেষক প্রদীপ ভট্টাচার্য—"Santaldih-Its Pollution and the People: An Ecological Study" তে (বোকারো 1990 এর সেমিনারে পঠিত) লিখেছেন গবেষণার কাজে কিছুদিন সাঁওতালদি প্রকল্পে থাকার সময় দেখেছেন দুটি ইউনিট

চলছে, মোট উৎপাদন হচ্ছে একটিতে 80 মেগাওয়াট অপরটিতে 90 সাকুল্যে 170 মেগাওয়াট! বজবজের প্রকল্প 500 মেগাওয়াটের কাছাকাছি কিছু একটা উৎপাদন করবে আশা করা মুসকিল, তবে এতে কলকাতার কর্মনিয়োগ—শিল্প অবস্থার উন্নতি হবে বলে যে রকম প্রচার করা হচ্ছে তা ঠিক পূরণ হবে না। কারণ বন্ধ কলকারখানা বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হচ্ছে না—অন্য নানা কারণে বন্ধ হচ্ছে। যেসব রাজ্যে বিদ্যুৎপরিস্থিতি ভালো সেখানেও লক্ আউট, লে অফ্, বেকারত্ব চলছে। কলকাতার পাব্লিককে বোঝানো হচ্ছে উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ দরকারী তাই প্রায় এক লাখ লোক যদি সর্বহারা উদ্বাস্তু হয়ও তাকে মেনে নিতে হবে। এই রকম অনুচ্চার ideological প্রচারের মধ্যে একটা বিরাট জুয়াচুরির কৌশল আছে। বাস্তব এই, যতজন চাষী জেলে ও ইটভাঁটা শ্রমিক বেকার হবেন তার চেয়ে খুব বেশি সংখ্যক লোক যে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ পাবেন বা কাজে টিকে থাকার সুযোগ পাবেন তা নয়। কিছু বড় কারখানা সস্তায় বিদ্যুৎ পাবে, আরাম বিলাসের উপকরণ যেমন এয়ার কন্ডিশনার বেশী সংখ্যায় চলবে, সিনেমার সময় টিভির লোডশেডিং একটু কমবে মেট্রোপলিটন পাব্লিক একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলবে। বিদ্যুৎ আসবে, তাতে পুরো চাহিদা মিটবে না, কারণ চাহিদা তখন আও বেড়ে যাবে, ভাঙ্গা অর্থ নীতি তাতে জুড়বে না, তার জন্য অন্য রং এর প্রেস্কৃপশন চাই। কিন্তু যে বিদ্যুৎ আসবে তার জন্যে মূল্য কি শুধু বস্তুচ্যুত এক লক্ষ লোকই দেবেন? বাকিরা কি সর্বনাশের ধাক্কা থেকে পার পেয়ে যাবেন?

সি ইএস্‌সি থেকে আগে ভাগেই বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হয়েছে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবেনা-চিমনীতে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর (ESP) বসানো হবে। প্রথমতঃ ESPতে নির্গত কণাকে কমায়, ধোঁয়া কিছু কম কালো হয় কিন্তু অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস যেমন সালফার অক্সাইড কার্বন মনক্সাইড এগুলি কমে না। দ্বিতীয়ত, ESP নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের সব প্রতিশ্রুতিই ছেঁদো। "গঙ্গার দুপারে ত্রিবেণী ও ব্যান্ডেলের মানুষজন ব্যান্ডেলের তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে ছাইএর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হচ্ছেন। হাঁপানি, ত্বকের প্রদাহ আর চোখের অসুখের শিকার এক বিরাট সংখ্যক মানুষ।" WBSEB এর জেনারেল ম্যানেজার পি কে চক্রবর্তীর চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে এই প্রকল্পের জন্য ESP-র অর্ডার দেওয়া হয়েছিল এক বছরেরও আগে—এটি এখনও বসানো হয়নি। অথচ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প তার উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে।" (উৎসমানুষ ফেব্রুয়ারী, 1992)। "সাওতালডিতেও এক নং ও দুই নং ইউনিটে কোনও ESP নেই। আর 3 নং ইউনিটে ESP খারাপ হয়ে গেছে" (প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, ibid)।

ESP বাদেও আরেকটি প্রশ্ন। বর্জ্য তরলকে শোধন করে শীতল করে গঙ্গার (হুগলী) জলে ফেলা হবে কি? এ ব্যাপারে কিন্তু CESC-র বিজ্ঞাপনে কিছু নেই। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে তা হবেনা। সেক্ষেত্রে জলের দূষণের সংগে সংগে ইলিশমাছ আসাও বন্ধ। ফরাককার ওই রোগে ভাগলপুরের জেলেরা অনাহারে মরছে। বজবজের জন্য কিছুটা নীচের ও উপরের নদীতে ইলিশ মাছ আর ধরতে হবে না। তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে কি রকম বায়ু দূষণ হ'তে পারে তা জানার জন্য নীচের তালিকার দিকে তাকানো যাক ঃ

চারশো মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে এক বছরে নির্গত পদার্থ :

দূষিত পদার্থ	কয়লা ব্যবহারে	তেল ব্যবহারে	প্রাকৃতিক ব্যবহারে গ্যাস
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
এলডেহাইড্ সমূহ	4.6×10^{4}	1.03×10^{4}	2.72×10^{1}
নাইট্রোজেন অক্সাইড্ সমূহ	1.84×10^{7}	1.91×10^{7}	1.05×10^{7}
সালফারের অক্সাইড্ সমূহ	1.22×10^{8}	4.64×10^{7}	1.08×10^{4}
কার্বন মনোক্সাইড্	4.6×10^{5}	7.36×10^{3}	অল্প
হাইড্রোকার্বন সমূহ	1.84×10^{5}	5.88×10^{5}	অল্প
কণা সমূহ	3.96×10^{6}	6.4×10^{5}	4.08×10^{6}

সূত্র : (Terrill ও অন্যান্যরা J. In. Med. & Surg 3-6, 42, 1967)

ঐ একই ব্যাক্তির কাজ থেকে জানা যায় কয়লার তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের (বজবজের টি কয়লা চালিত হবে) সংলগ্ন এলাকায় মাটির কাছাকাছি জায়গায় দশলক্ষ ভাগ বাতাসে কত ভাগ (ppm) বিষাক্ত দূষণগ্যাস রয়েছে আর কতভাগ থাকলে তা বিপদজনক। তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে বিদ্যুতের জন্য আশেপাশের মানুষ জীবজন্তু ও গাছপালাকে কত মূল্য দিতে হবে।

বিষরাসায়নিক (দূষণ পদার্থ)	কতভাগ আছে (ppm)	কতভাগ হলে বিপদ (ppm)
অ্যালডেহাইড্	0.19	অজানা
নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ	79	1.0
সালফারের অক্সাইড্ সমূহ	240	0.1
কার্বনমনোক্সাইড্	2.08	1.0
হাইড্রোকার্বন	1.47	অজানা
কণাপদার্থ	0.036	অজানা

সালফারের অক্সাইড যৌগ সালফারডাই-অক্সাইড (SO_2) হিসেবে বেরিয়ে সালফারট্রাই অক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) হয়। অল্প পরিমানে H_2SO_4 ফুসফুসে গেলেও সর্বনাশ। কেউ যদি এক ঘণ্টা করে এক PPM SO_2 নিঃশ্বাসে নেয় বা 0.3 PPM হিসাবে আট ঘণ্টা নেয় তা বিপদজনক [Abraham, Env. Health 1970] সেখানে তাপবিদ্যুৎ থেকে বের হচ্ছে কাছের এলাকায় 240 পি পি এম। তাই

শুধু প্রাণী নয়, উদ্ভিদেরও বিপদ। এমনকি ঘরবাড়ীর রংও নষ্ট হবে দেওয়ালের গাঁথনির জোর কমবে। তাই পরিবেশ মন্ত্রকের guide line-এ বলা আছে (1987'র গাইডলাইন 2.2.1)।

"তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের অবস্থান যেন নীচের জিনিসগুলি থেকে 25 কিমি দূরত্বের মধ্যে না হয়। যেমন, 1) মেট্রোপলিটান শহর, 2) ন্যাশনাল পার্ক এবং বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য, 3) বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে সংবেদনশীল অঞ্চল। যেমন—ট্রপিক্যাল জংগল, জীবমণ্ডল রিজার্ভ, জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য, গুরুত্বপূর্ণ হ্রদ, এবং প্রবাল গঠনে সমৃদ্ধ সমুদ্রতীর অঞ্চল। ঐ গাইড্ লাইনের 2.2.6 এ বলা হয়েছে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি যেন প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ও পর্যটনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গার বা প্রতিরক্ষার কারখানাগুলির ধারে কাছে (যেমন 10 কিলোমিটারের মধ্যে) না হয়।

জানিয়ে রাখা ভালো সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দিক থেকে অছিপুরের চীনা-মন্দির খুব গুরুত্বপূর্ণ। বোটানিকাল গার্ডেনের 150 বছরের সম্পদ বজবজের SO_2 থেকে দশবছরও বাঁচবে কিনা সন্দেহ। আরও বিপদ এইজন্য যে কোলাঘাটের ছাইপড়া অঞ্চল এবং বজবজের ছাইপড়া অঞ্চল পরস্পর সংলগ্ন ও সংযুক্ত হওয়ায় একটা ব্যাপক অঞ্চলে হাওয়া চলাচলের মাধ্যমে দূষণের চাদরের মধ্যে সুস্থতার বাতাস আসার সম্ভাবনা থাকবেনা। আর কলকাতার সীমা ব্রেসব্রীজ, মেটেবুরুজ পর্যন্ত। সেখান থেকে বজবজের দূরত্ব রেলের টাইমটেবিলে দেখুন 12 কিলোমিটার। সেখান থেকে পূজালি 6 কিমি। মোট 18 কিলোমিটার। স্পষ্টতই পরিবেশ মন্ত্রকের গাইড্ লাইন মানা হয়নি। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। আর এই গাইড্‌লাইনকে হাইকোর্টের বিচারকেরা কতটা গুরুত্ব দেবেন বলা মুস্কিল। 1937'র গাইড্ লাইনের ভাষা এমন যাতে সরাসরি বলা হচ্ছেনা যে গাইড্ লাইন ভাঙ্গা চলবেনা।

1985'র গাইড্ লাইনে স্পষ্ট লেখা ছিল (গাইড্ লাইন 2.3) No Prime agricultural land shall be converted into industrial site. কোনো মুখ্যতঃ কৃষিজমিকে শিল্পের জায়গাতে বদলানো চলবেনা।

সেক্ষেত্রে 1987'র Environmental guide lines for Thermal Power plants এ লেখা আছে (2.2.8) "No forest or prime agricultural land should be utilised for setting up of TPS (Thermal Power Station) or for ash disposal"

কোন জংগল বা মুখ্যতঃ কৃষিকাজের জমিকে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের বা ছাই ফেলার জন্য ব্যবহার করা উচিত হবে না।

জোরদার আগের shall কথাটার বদলে কৌশলে Should ঢোকানো হয়েছে যেন Thermal power plant এর নিয়ম শিল্পের নিয়ম থেকে আলাদা হবে; অর্থাৎ TPS যেন শিল্প নয়! যুক্তি দিয়ে এ রকম বদলানোকে ব্যাখ্যা করা যায়না। এসব হল পরিবেশ মন্ত্রকের কারসাজি। এই কারসাজি আটকাবার জন্যই লোকে ভোট দিয়ে এম্ পি করে নেতাদের পাঠান।

সাঁওতালডিতে দূষণের ফলে আশেপাশের লোকের কি অবস্থা হয়েছে প্রদীপ ভট্টাচার্যের ভাষায় পড়ুন—"অঞ্চলের সবচেয়ে মারাত্মক প্রদূষণ হচ্ছে বায়ু প্রদূষণ। এলাকায় দুটি কয়লার ইয়ার্ড আছে একটি SIPS এ অন্যটি কোল ওয়াশারি প্ল্যান্ট। এই দুটি থেকে পোড়াডিহি, চাকবাঁধ, আরাশ্ডি, কাঁকি, শ্যামপুর, বাগুরা ইত্যাদি পর্যন্ত বিশেষতঃ জোর হাওয়ার সময় কয়লার ধুলো উড়ে যায়। সব চেয়ে জঘন্য হচ্ছে ছাই (fly-ash)। STPS এর ল্যাবরেটরীর থেকে থেকে জানা গেছে এখানকার কয়লায় শতকরা 45 থেকে 50 ভাগ ছাই। ESP না থাকায় প্রায় সবটাই চিমনী দিয়ে বের হয়।...যেহেতু প্রায় সব কটা স্ক্রেনারই অকেজো কয়লার ছোট গুঁড়োও বেরিয়ে আসে। ছাই আর কয়লাগুঁড়ো মিলে লোকেদের জীবন দুঃসহ করে দিয়েছে। লোকে বাইরে বসতে পারেনা গরম কালে বাইরে শুতে পারে না। বাড়ীর খড়ের ছাউনি প্রতিবছর বদলাতে হয়। ছাই এর সংগে তেলচিটে ভাব থাকে, সম্ভবতঃ বাজে কয়লাবলে সংগে তেল দিয়ে জ্বালানো হয় সেইজন্য।

বায়ুদূষণের জন্য এলাকার লোকে এজমা, ব্রংকাইটিস ও ফুসফুসের অন্যান্য রোগে ভুগছে। রোগীদের শতকরা দু ভাগ চামড়ার অসুখ, মূলতঃ এলার্জিধরনের অসুখে ভোগে। চোখে ছাইপড়া খুব সাধারণ ঘটনা। অসাবধানে অনেকে অন্ধও হয়েগেছে।...ছাই ও কয়লার গুঁড়ো পড়ে সব্জি, কপি, বেগুন ও টম্যাটো চাষের ক্ষতি হচ্ছে। আনাজগুলি খুব ছোট সাইজের হচ্ছে আর তা পোকায় ধরা।...আশে পাশের গ্রামের গবাদি পশুরা বিশেষ করে দূষিত জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তেলচিটে ছাইমাখা ঘাস খেয়ে গরুর দাঁত ক্ষয়ে যাচ্ছে।" লেখক যদিও সাঁওতালডির ল্যাবরেটরীর কর্মীদের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে সালফারের জন্য বিশেষ ক্ষতি 5 কিমি ব্যাসার্ধের বাইরে হচ্ছেনা, তবু গরুর দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার ঘটনাটিই প্রমান, তেলচিটে ছাই এর সংগে সাল্‌ফিউরিক এসিড্ মিশ্রিত।

সাঁওতালডিতে কি ঘটছে সে ব্যাপারে লম্বা উদ্ধৃতি দিলাম এই জন্য যে পূজালি ও অন্যান্য আটটি তালিকাভুক্ত গ্রাম ছাড়াও আশে পাশের যে এলাকাগুলি রয়েছে সেখানকার লোকেরা বিপদটি বুঝতে পারবেন। সাঁওতালডির চেয়ে বিপদ এখানে বেশী। তার কারণ এখানে লোকের বসতি খুব ঘন। কারখানার জন্য বাতাসে দূষণের লেভেল এমনিতে উঁচুতে এটা ব্রেসব্রীজের দিকের এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি বজবজের TPS এর ছাই ও গ্যাস কলকাতার খিদিরপুর, নিউ আলিপুর বেহালাতেও যে হাওয়ার ঠেলায় চলে আসবে তা জোর দিয়েই বলা যায়। জলের দূষণের ব্যাপারে একটা সাবধান বাণীই করা যায় গংগা নদী অনেক সইছে তার পর বজবজের TPS এর বর্জ্য তরল তার কতটা সইবে তা কে বলতে পারে? নিশ্চয় কিছু পাব, কিন্তু তার বদলে কি মূল্য আমাদের ভাবিষ্যত প্রজন্মকে দিতে হবে? শুধু এক লাখ লোকের দীর্ঘশ্বাসই নয়, ভাবী দিনের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বিকল্প পথের কথা আমাদের ভাবতেই হবেই। □

ব্রেথওয়েটে দুর্ঘটনা

ব্রেথওয়েট কারখানায় দুর্ঘটনার পর সরেজমিনে তদন্তে গিয়েছিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি এবং ডিরোজিও গণবিজ্ঞান কেন্দ্রের একটি দল। লেখাটি তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রচিত।

গত 20/7/92 তারিখের বিকেল 4-40 মি. নাগাদ হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্রেথওয়েট অ্যাংগাস কারখানার ফাউন্ড্রি বিভাগে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনা বিষয়ে তথ্য আহরণ করার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও ডিরোজিও গণবিজ্ঞান কেন্দ্রর যৌথ উদ্যোগে দশ সদস্যের এক তথ্যানুসন্ধানী দল 24/7/92 তারিখে ভদ্রেশ্বরে যায়। ঐ দল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং দুর্ঘটনার কারণ, দায়দায়িত্ব ও এ ধরণের ঘটনা এড়ানো সম্ভব ছিল কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে কারখানার ম্যানেজমেণ্ট, বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ কারখানার কর্মী এবং নিহত ও আহত কর্মীদের আত্মীয় পরিজনসহ অসংখ্য সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে কারখানার কর্মীরা তথ্যানুসন্ধানী দলকে যা বলেছেন তা বিস্ময়কর। যে ফার্নেসে দুর্ঘটনাটি ঘটে সেটি মাত্র দুমাস আগে চালু করা হয়েছিল। ফার্নেসের কর্মীরা সকলেই Arc furnace-এ কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন—তাছাড়া বার্ন স্ট্যান্ডার্ড'এ নিয়ে গিয়ে Arc furnace-এ কাজ করার একটা শর্টকোর্স ট্রেনিংও তাঁদের দেওয়ানো হয়েছিল। অথচ এই কর্মীদেরই পরে GECর কাছ থেকে কেনা নতুন ধরনের Induction furnaceএর কাজে লাগানো হয়েছিল, যে কাজের অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ কোনোটাই তাদের ছিল না। GEC-র ইঞ্জিনীয়াররা ব্রেথওয়েট এসে প্রথম কুড়িটি চার্জ নিজেরা সম্পন্ন ক'রে কর্মীদের একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেন। তথ্যানুসন্ধানী দল বিভিন্ন পক্ষের সাথে আলোচনায় বুঝেছেন তাদের এই শিক্ষা পর্যাপ্ত ছিল না।

ফার্নেসে কর্মরত কর্মীদের শারীরিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে চূড়ান্ত অবহেলার চোখে দেখা হয়েছিল। ফাউন্ড্রী কর্মীদের অভিযোগ বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে ফার্নেসে কাজ করার উপযুক্ত পোষাক, জুতো, গ্লাভস্ ইত্যাদির জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও কাজ হয়নি। তারা গেঞ্জী, হাওয়াই চপ্পল পড়ে কাজ করতেন। কোম্পানীর চিফ পার্সোনাল, ম্যানেজার টি. কে. দত্ত অবশ্য এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেছেন সব রকমের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাই তাঁরা কর্মীদের দিয়েছিলেন—যেমন, অ্যাসবেসটস কভার, গ্লাভস, গগলস্ প্রভৃতি। তার বক্তব্য অ্যাসবেসটস কভার থাকার জন্য নিহত বা আহত সকলেরই শরীরের সম্মুখ ভাগটা অক্ষত ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার সময়ে যিনি ক্রেন অপারেট করছিলেন তিনি এবং প্রত্যক্ষদর্শী সকল কর্মীই জানালেন, একেবারেই সাদা পোষাকে কর্মীরা ফার্নেসে কর্মরত ছিলেন এবং শরীরের সম্মুখভাগ কারো ক্ষেত্রেই অক্ষত ছিল না। তাছাড়া ফাউন্ড্রী কর্মীরা নিরাপত্তামূলক পোশাক আশাকের যে সব নমুনা দেখালেন তা আদৌ ফার্নেসে কাজ করার উপযুক্ত নয়। হেলমেট কোনোদিনই দেওয়া হয়নি। ফাউন্ড্রীর ডেপুটি ম্যানেজার এস. কে. ব্যানার্জী জানালেন, দুর্ঘটনার দিন সকালে জুতো কেনা হয়েছিল—হতভাগ্য কর্মীদের কাছে সে জুতো আর পৌঁছয়নি। মৃত কর্মীদের পোষাক-আশাকের যে সামান্য চিহ্ন এখনো দুর্ঘটনাস্থলে পড়ে আছে তা দেখেও তথ্যানুসন্ধানী দল নিঃসন্দেহ যে কর্মীদের শারীরিক নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতি ছিল। পঃ বঙ্গ সরকারের ফ্যাক্টরি ইন্সপেকটর এ ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। ফার্নেস কর্মীদের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে তিনিও কোনো উদ্বেগ না দেখিয়ে পরোক্ষে এই ধরণের মারাত্মক ঘটনা ঘটতে দেবার পথ সুগম করেছেন।

দুর্ঘটনা ঘটার পর এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কারখানার ডাক্তারের ডিউটি সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত। দুর্ঘটনা ঘটে চারটে বেজে চল্লিশ মিনিট নাগাদ। সিকিউরিটি অফিস ঐ সময় বন্ধ থাকায় সময়মতো টেলিফোন করা যায় নি। ডাক্তার ডেকে আনতেও বেশ সময় লেগে যায়। দুটো আমবুলেন্সই অকেজো অবস্থায় পড়েছিল—ছিল না একখণ্ড স্ট্রেচারও। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ক্রেন অপারেটর জানালেন বাইরে থেকে মালবাহী লরী ও ভ্যান রিক্সা ধরে এনে তাঁরাই আহত কর্মীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। স্ট্রেচারের বদলে চটের বস্তা করে মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করা দগ্ধ কর্মীদের লরী বা রিক্সায় তোলা হয়। দুর্ঘটনা ঘটলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনো রকম ভাবনা চিন্তা ছিল বলে মনে হয় না। দুর্ঘটনা পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ম্যানেজমেণ্ট কোনো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দিতে পারে নি।

দগ্ধ মানুষের চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো গৌরহাটি E. S. I. হাসপাতালের ছিল না। কারখানা কর্তৃপক্ষর এ ব্যাপারে আগে থাকতেই E.S.I. হাসপাতালের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল।

তথ্যানুসন্ধানী দলের মনে হয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ এখন দায়িত্ব এড়াতেই বেশী ব্যস্ত। চিফ পারসোনাল ম্যানেজার টি. কে. দত্ত অভিযোগের ভঙ্গীতে বললেন, নিহত চাতুরী সাউ এবং অন্য একজন যিনি গুরুতর আহত হয়ে এখন হাসপাতালে আছেন—এই দুজন ছাড়া অন্যদের

দুর্ঘটনাস্থলে থাকার কথা ছিল না। কেউ কেউ গল্পগুজব করতে এবং একজন তো স্রেফ চা খেতেই নাকি দুর্ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। ফাউন্ড্রী ও মেইনটেন্যান্সের সমস্ত কর্মী এবং ফাউন্ড্রীর ডেপুটি ম্যানেজার এস. কে. ব্যানার্জী এক বাক্যে বললেন, নিহত ও আহত সকলেই ফাউন্ড্রীর কর্মী এবং কর্তব্যরত ছিলেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ক্রেন অপারেটর ও মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে ফেরা এক ফার্নেসকর্মী দ্ব্যর্থহীন ভাবে বললেন, নিহত বা আহত সকলেই কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন। কারখানার চিফ ম্যানেজার তথা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সমবেদনার পরিবর্তে নিহত ও আহত কর্মীদের উপর দোষ আরোপ করার প্রচেষ্টাকে অন্যায়, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অমানবিক বলে তথ্যানুসন্ধানী দল মনে করে।

দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণটি হয় কর্তৃপক্ষ চেপে যাচ্ছেন নয়তো এ সম্বন্ধে তাঁদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। চিফ পারসোনাল ম্যানেজার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে বলে এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ফাউন্ড্রী কর্মীরা জানালেন Induction furnace-এর ব্যাপারে তারা কেউই বিশেষ কিছু বুঝতেন না। জনৈক এক্সপার্ট মিঃ নায়েক, সিনিয়র ম্যানেজার মেইনটেন্যান্স পি. কে. রায় তাঁর অ্যাসিষ্ট্যান্ট বরুণ দত্ত (দুর্ঘটনায় নিহত) এবং ডেপুটি ম্যানেজার ফাউন্ড্রী এস. কে. ব্যানার্জীর নির্দেশ মতই তাঁরা operate করতেন। তবে দুর্ঘটনার দিন ফার্নেসের কিছু ত্রুটি তাঁদের অনেকেই লক্ষ্য করেছিলেন। মেইনটেন্যান্সের এক ইলেকট্রিসিয়ান বললেন, water circulation system-এ গলদ দেখা দিচ্ছিল বলে Resin মিশিয়ে normal rate-এ আনার চেষ্টা চলছিল। সে চেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ায় সকালের দিকে ফাউন্ড্রী বন্ধ করে দেওয়া হয়। মেইনটেন্যান্সের সিনিয়র ম্যানেজার পি. কে. রায়ও বললেন, এগারোটার সময় তিনি ফাউন্ড্রী বন্ধ রাখতে বলেন টেকনিক্যাল কারণে। তারপর বারোটায় আবার ফাউন্ড্রী চালু করার নির্দেশ দেন। কর্মীদের অনেকেই লোড-শেডিংকেও দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে ধরছেন। তাঁদের বক্তব্য, ফাউন্ড্রীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে গলিত লোহা ক্রমশঃ শীতল হতে থাকে এবং ফুটন্ত লোহার উপরে একটা স্তর পড়ে যায়। পরে বিদ্যুৎ এলে আবার ফাউন্ড্রি চালু হয় এবং তারপর চাতুরী সাউ নামে এক কর্মী সর পড়ার মতো স্তরের উপর খোঁচাতে থাকে। স্তরের নীচে তরল লোহা তখন যোলোশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ফুটছিল। খোঁচানোর ফলে উপরের স্তরে ছিদ্র হলে ভিতরের গলিত তরল লোহা তুবড়ীর মতো ছিটকে চারপাশ ছেয়ে ফেলে। বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকলে গলিত লোহার উপরের এবং নীচের অংশের তাপমানের হেরফের ঘটতো না এবং এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো না বলে তাঁরা মনে করছেন। CESC-র গৌরহাটি ডিসট্রিবিউশন স্টেশনের চার্জম্যান তথ্যানুসন্ধানী দলের কাছে জানিয়েছেন ঐদিন বেলা 3-35 মি. থেকে 3-50 মিঃ পর্যন্ত কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। ফার্নেস চলাকালীন বিদ্যুত সরবরাহ অব্যাহত রাখতে কারখানা কর্তৃপক্ষ খুব একটা সজাগ ছিল বলে মনে হয় না।

ঠিক কতজন দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল এ ব্যাপারটি কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করতে রাজী হন নি। কর্মীদের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন অফিসের সূত্রে জানা গেছে এখন পর্যন্ত যারা মারা গেছেন তারা হলেন: 1) চাতুরী সাউ (53) 2) ধরমনাথ সাউ (52) 3) দীননাথ মাহাতো (22) 4) পরেশনাথ নিয়োগী (53) 5) লালজী সাউ (55) 6) প্রহ্লাদ পাত্র (49) 7) চন্দ্রাবলী আহীর (56) 8) বরুণ দত্ত (25)। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালে এখনো মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন গুরুতর ভাবে আহত ছজন কর্মী।

মৃত কর্মীদের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে তথ্যানুসন্ধানী দল জেনেছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ তাঁরা আড়াইশো টাকা করে পেয়েছেন। এছাড়া আর কোন রকম ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি তাঁদের কেউ দেননি। চিফ পারসোনাল ম্যানেজার অবশ্য বললেন যে, তাঁরা প্রতি মৃত কর্মীর পরিবারকে এক লক্ষ টাকা, গুরুতর আহতদের পঁচিশ হাজার টাকা এবং অল্প আহতদের তিন হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানী দল এরকম কোনো প্রতিশ্রুতির কপি নোটিশ বোর্ড বা অন্য কোথাও দেখতে পায়নি। নিহত বা আহত কর্মীদের আত্মীয় পরিজন ও সহকর্মীরা এখনো এই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান। দুর্ঘটনায় নিহত ধরমনাথ সাউ-এর ভাই রামনাথ সাউ জানালেন, একযুদিনের মধ্যে একবারও কারখানা ম্যানেজমেন্টের কেউ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দূরের কথা মৌখিক সমবেদনা পর্যন্ত জানাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি।

কারখানার ইউনিয়নগুলির ভূমিকাও তথ্যানুসন্ধানী দলের কাছে সমালোচনার উর্দ্ধে নয় বলে মনে হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে ইউনিয়ন কর্তাদের মুখে। INTUC-র সেক্রেটারী বিজয় সিনহা তথ্যানুসন্ধানী দলের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ফার্নেসের দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। যদিও তিনি এই ধরনের ফার্নেসের বিষয়ে কিছু জানেন না বলে স্বীকার করেন। এই ধরনের ফার্নেসের কাছে প্রশিক্ষণ নেই এমন সব মজদুর দিয়ে কেন ফার্নেস চালাতে দেওয়ার বিরোধিতা করা হয়নি এ প্রশ্নেরও তিনি কোনো জবাব দিতে পারেন নি। CITU-র Asst. Secretary দেবব্রত সাহার বক্তব্যও সমান নৈরাশ্যজনক। ফার্নেস কর্মীদের নিরাপত্তামূলক পোষাক-আশাক ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করাতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করানোর মতো কোনো কর্মসূচী তাঁরা নিতে পারেন নি বলে তিনি স্বীকার করেছেন। তাছাড়া শারীরিক নিরাপত্তা পাওয়াকে একজন শ্রমিকের বাঁচবার অধিকার হিসাবে না দেখে তিনি তাকে শ্রমিক কল্যান কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ধরছেন এটা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের কর্মীদের কাছে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। INTUC, CITU ও AITUC তিনটে ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের নিজ নিজ ভাষ্য অনুসারে লক আউটের হাত থেকে কারখানা বাঁচানোকেই তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারখানার সাড়ে চৌদ্দশো কর্মচারীর রুটিরুজির দিকে লক্ষ্য রেখে নিরাপত্তার দিকটিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে পারেন নি—তারা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আজ প্রশ্ন উঠতেই পারে জীবিকার স্বার্থে জীবনের বিনিময়ে কারখানা বাঁচিয়ে কী লাভ, কার লাভ? ◻

পশ্চিমবঙ্গে পারমানবিক-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র

গণবিজ্ঞান সমন্বয়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী এক মাসের মধ্যে একটি প্রতিবাদপত্র গণস্বাক্ষরসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠান হবে। প্রতিবাদ পত্রটির বয়ানটি দেওয়া হল।

—সঃ মঃ, বি ও বি

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাশয়,

সংবাদপত্র (The Statesman 6.6.92, ওভারল্যান্ড 6 6.92 এবং আনন্দবাজার পত্রিকা 15.6.92) থেকে জানতে পারলাম যে গত 5ই জুন, '92 মহাকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রাজ্যসরকার পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থানে (বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য) একটি পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বসাতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছেন। এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিপন্ন বোধ করছি।

বিগত চল্লিশ বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা, সমীক্ষা, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা বিভিন্ন দেশে হয়েছে তাতে আজ নিঃসন্দেহে এটা প্রমাণিত যে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের রাস্তা পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন নয় এবং এই প্রকল্প মানব সভ্যতার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে। পরিবেশের পক্ষে ভয়ংকর রকম বিপজ্জনক এই পদ্ধতি তেজস্ক্রিয়তায় ভরিয়ে তোলে উৎপাদনকেন্দ্র ও তার চারপাশের বহুদূর পর্যন্ত অঞ্চল। পারমানবিক চুল্লীতে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিরাপদ সংরক্ষণ বা আয়ুষ্কাল শেষে চুল্লী কবরস্থ করা বিজ্ঞানীদের কাছে আজও যথেষ্ট উদ্বেগ ও গবেষণার বিষয়, প্রকৃত অর্থে কোন নিরাপদ ব্যবস্থাগ্রহণ আজও সম্ভব হয়নি—যদিও মৃত্যু গবেষণার জন্য অপেক্ষা করে থাকে না। এই ধরণের চুল্লীতে কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটলে কী বিরাট বিপদ ও জাতীয় জীবনে কী বিপর্যয় ঘটতে পারে রাশিয়ার চের্নোবিল তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

পৃথিবীর নানাদেশে আজ তাই এই ধরণের প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই প্রতিবাদের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে 1979-র পর এই ধরনের নতুন কোন প্রকল্প গৃহীত হয় নি, ডেনমার্ক সরকার 1985 সাল থেকে এই কর্মসূচি বাতিল করেছে, অস্ট্রিয়া তার একমাত্র চুল্লীটি বন্ধ করেছে। সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়াও ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে এর উৎপাদন।

আমরাও চাই ভারত সরকার অবিলম্বে তার পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি বাতিল বলে ঘোষণা করুক। আমরা চাইনা পশ্চিমবঙ্গে এ ধরণের কোন পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। কলিকাতার শেরিফ, শ্রীসনৎ বিশ্বাস, যিনি একজন পারমানবিক প্রযুক্তিবিদও বটে তিনিও পশ্চিমবঙ্গে এ ধরণের কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করে সংবাদপত্রে (আজকাল, 20 6 92) মত প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছেও পশ্চিমবঙ্গে পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে চিঠি দিয়েছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রীঅমিয় বাগচী, কলিকাতা ও কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র শ্রীমণি সান্যাল, শক্তি উৎপাদন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনার্জি স্টাডিজ-এর অধ্যাপক শ্রীসুজয় বসু প্রমুখ। বহু গণবিজ্ঞান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষা বিষয়ক সংগঠনও এই দাবী জানিয়েছেন রাজ্যপালকে।

আমরা আশা করি এই সমস্ত প্রতিবাদকে আপনি মর্যাদা দেবেন, মানবস্বার্থবিপন্নকারী এরকম একটি পরিকল্পনাকে অবিলম্বে বাতিল বলে ঘোষণা করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীকে উদ্বেগ থেকে মুক্ত ও বিপন্নতা থেকে রক্ষা করবেন।

R. N. 34929/79
YEAR 15, NUMBER 3-4
Nov.-Dec. '91 Jan.-Feb. 92

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
C/o Dr. A. Lahiri
P 252 Laketown, Block A, Calcutta
Pin. : 700089

ভিলাই ফায়ারিং রাহাত কোষ

আন্দোলনরত ভিলাই শ্রমিকদের উপর পুলিশি হামলা আজও অব্যাহত। বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা জরুরি প্রয়োজন। এজন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে আছেন হরি ঠাকুর, মেধা পাটকার, নন্দিতা হাকসার এবং বিনায়ক সেন।

আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন কমিটির কার্যকরী সম্পাদক। যোগাযোগের ঠিকানা ডাঃ বিনায়ক সেন, প্লট নং ২০, সুন্দর নগর, রায়পুর।

Bhilai Firing Rabat Kosh, Raipur

এই নামে ক্রসড্ চেক বা ড্রাফ্ট পাঠাতে হবে।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15C পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9 থেকে মুদ্রিত।